SUNNATE RASUL [S]
O
CHAR IMAMER OBOSTHAN

সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ও

চার ইমামের অবস্থান

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)
ইমাম মালিক (রহ.)
ইমাম শাফি'য়ী (রহ.)
ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.)

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
প্রিন্সিপাল
মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা

সুন্নাতে রাসূল ও চার ইমামের অবস্থান

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

প্রকাশক : আবদুল্লাহ, আম্মার, আহমাদুল্লাহ, নাছরুল্লাহ, সা'দ ও সাঈদ।

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০০৯ঈঃ
সফর ১৪৩০ হিজরী
দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১১ঈঃ
সফর ১৪৩২ হিজরী

মূল্য : ৮০ (আশি) টাকা মাত্র।

কম্পিউটার কম্পোজ প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ :

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল
ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১১২৭৬২, ০১১৯০-৩৬৮২৭২,
০১৭১১-৬৪৬৩৯৬, ০১৯১৯-৬৪৬৩৯৬
ওয়েব সাইট : www.tawheedpublications.com
ই-মেইল : tawheedpp@gmail.com

প্রসঙ্গ কথা

আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে এক মহৎ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু মানব জাতি যখন প্রকাশ্য শত্রু ইবলিসের খপ্পরে পরে বিভ্রান্ত হয়ে দিশেহারা উম্মাদের ন্যায় জীবন যাপন করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ দিশেহারা পথভোলা জাতিকে পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে নাবী-রাসূল প্রেরণ করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾

"এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি- যাতে তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আন।" [সূরা ইবরাহীম : ১]

নাবী-রাসূলদের প্রেরণের উদ্দেশ্য শুধু মানুষদের পথ দেখানই নয় বরং অপর উদ্দেশ্য হলো মানব সমাজ তাঁদের আনুগত্য স্বীকার করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

"মূলতঃ আমি শুধুমাত্র এ উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশে তাঁদের আনুগত্য স্বীকার করা হয়।" [সূরা নিসাঃ ৬৪]

সুতরাং নাবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য হল একমাত্র তাঁদের অনুসরণ করে আল্লাহর দ্বীন পালন করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, বর্তমান মুসলিম সমাজ বিভিন্ন দল ও মতে বিভক্ত এবং আপন নেত্রীবর্গের আনুগত্যে মগ্ন। যদি সুন্নার দিকে আহবান জানানো হয়, তখন জবাব আসে আমাদের ইমামের মাযহাবে বা তরীকায় ঐ হাদীসের নিয়ম নেই, তাই আমরা মানিনা, বড়ই আফসোসের বিষয় একজন মানুষের এরূপ জবাব হলে কিভাবে সে ঈমানদার হতে পারে? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾

"তোমার রবের কসম- তারা কখনও ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ-না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ফায়সালাকারী হিসাবে মেনে নেয়। অতঃপর তোমার ফায়সালা মানার ব্যাপারে তারা অন্তরে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করে নিবে।" [সূরা নিসা : ৬৫]

বরং প্রকৃত ঈমানদারের পরিচয় হল রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহর প্রতি আহবান করা হলে সে তা মাথা পেতে মেনে নিবে এবং এরাই হবে সফলকাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"মুমিনদের বক্তব্য কেবল এরূপই হবে যখন তাদের মাঝে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে : আমরা শ্রবণ করলাম এবং আনুগত্য স্বীকার করলাম, আর তারাই হল সফলকাম।"
[সূরা নূর : ৫১]

আরো দুঃখের বিষয় হলো প্রসিদ্ধ ইমাম ও বিদ্বানগণের দোহাই দিয়ে বলা হয় যে, তারাই ঐ সব মত ও পথ সৃষ্টি করেছেন যার কারণে হাদীসের আহবানে সারা দেয়া যায় না। এটা কিভাবে হতে পারে অথচ ঐ সব মহামান্য ইমামগণ স্বীয় জাতির উদ্দেশ্যে বলে গেছেন ঃ إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ "যখন রাসূল ﷺ-এর কোন হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হবে তাহাই আমার মত ও পথ (ভিন্ন কিছু নয়)।" (ইকাযুল হিমাম ৬২ পৃঃ)

সুতরাং ইমামদের দোহাই দেয়া কখনই সঠিক হতে পারে না। এ লক্ষ্যে আমরা **"সুন্নাতে রাসূল ﷺ ও চার ইমামের (রহ.) অবস্থান"**- গ্রন্থে প্রিয় পাঠকের কাছে সঠিক বিষয়টি তুলে ধরতে চাই। আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামের সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমীন!

সঊদী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সমিতি, বাংলাদেশ-এর বুলেটিন "বার্তা"-র সম্পাদক অধ্যাপক আ.ন.ম. রশীদ আহমাদ সাহেবের প্রেরণায় "সুন্নাতে রাসূল ﷺ ও চার ইমামের (রহ.) অবস্থান" শীর্ষক আমার লেখা প্রবন্ধটি "বার্তা"-য় প্রকাশ হতে থাকলে পাঠক সমাজের সুপরামর্শ প্রবন্ধটিকে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করে। গ্রন্থটি প্রকাশে প্রস্তুত হওয়ায় সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা অতঃপর গ্রন্থটি প্রকাশে যারা প্রেরণ ও সহযোগিতা দিয়েছেন তাদের জন্য বিশেষ জাযায়ে খাইর কামনা করছি। আল্লাহ্ এ গ্রন্থের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম সমাজকে উপকৃত করুন, আমীন!

বিনীত

১৫/০২/২০০৯ ইং

আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ খান মাদানী
প্রেসিডেন্ট, ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন।
প্রধান মুফাসসির, শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা
ধামরাই, ঢাকা
মোবাইল ঃ ০১৭১৫-৩৭২১৬১

সূচীপত্র المحتويات

الباب الأول

تعريف السنة و أهميتها في الإسلام و حجيتها وعلاقتها مع القرآن

الباب الثاني

نبذة من حياة الأئمة الأربعة وموقفهم من اتباع السنة

পরিশিষ্ট : الخاتمة।

الباب الأول

تعريف السنة و أهميتها في الإسلام وحجيتها وعلاقتها مع القرآن

প্রথম অধ্যায়

সুন্নাহর পরিচয়, গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং কুরআনের সাথে সুন্নাহর সম্পর্ক

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুন্নাহ'র পরিচয়

সুন্নাহ (سنة) শব্দটি মুসলিম সমাজে একটি সুপরিচিত পরিভাষা, কিন্তু শব্দটি আরবী হিসেবে তার আভিধানিক ও পারিভাষিক একাধিক পরিচয় হতে পারে। নিম্নে সুন্নাহর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় তুলে ধরা হল।

সুন্নাহর আভিধানিক পরিচয় : সুন্নাহ (سنة) শব্দটির আরবী আভিধানিক অর্থ হল : اَلطَّرِيْقَةُ অর্থাৎ পথ ও পদ্ধতি, اَلسِّيْرَةُ অর্থাৎ আদর্শ ও রীতিনীতি, সুতরাং সুন্নাহ (السنة) -এর আভিধানিক অর্থ হল পথ ও পদ্ধতি, আদর্শ ও রীতিনীতি চাই তা ভাল হোক অথবা খারাপ হোক।[1]

"সুন্নাহ" এ অর্থেই কুরআন ও হাদীসে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

"তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে অনেক ধরণের জীবন পদ্ধতি, রীতি ও নীতি। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ- যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে।" [সূরা ঈমরানঃ ১৩৭]।

অত্র আয়াতে سُنَنٌ শব্দটি (سنة) সুন্নাহ এর বহুবচন, এ শব্দটি এখানে জীবন পদ্ধতি ও রীতি-নীতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

[1] লিসানুল আরব- ১৩/২২৫, তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস- ৯/২৪৪ পৃঃ। আল মু'জাম আল ওয়াসীত- ৪৫৬ পৃঃ।

কুরআনুল কারীমে এরূপ বহু আয়াত এসেছে।[২]

সুন্নাহ (سنة) শব্দটি একই অর্থে হাদীসেও বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ : فَمَنْ؟ (رواه مسلم)

সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির রীতি-নীতি বিঘতে-বিঘত, হাতে-হাত অর্থাৎ হুবহু অনুসরণ করে চলবে, এমনকি তারা গুইসাপের গর্তে প্রবেশ করলে তোমরাও তাদের অনুসরণ করে গর্তে প্রবেশ করবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! পূর্ববর্তী জাতি বলতে কি ইয়াহুদ ও নাসারা? তিনি বললেন : তাহলে আবার কারা?।[৩]

এ হাদীসে لتتبعن سنن এর মধ্যে سنن শব্দটি সুন্নাহ (سنة) অর্থাৎ "রীতি-নীতি ও জীবন পদ্ধতি" অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপ আরো বহু হাদীসে এসেছে।

অতএব সুন্নাহ (سنة) শব্দটি কুরআন, হাদীস ও আরবী ভাষায় "রীতি-নীতি, পথ ও পদ্ধতি" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই অধিকাংশের নিকট ইহাই সুন্নাহ (سنة) এর আভিধানিক অর্থ।[৪]

সুন্নাহর পারিভাষিক পরিচয় : ইসলামী শরীয়াতে যখন সাধারণভাবে সুন্নাহ (سنة) শব্দটি ব্যবহার করা হবে তখন এর অর্থ দাঁড়াবে নাবী ﷺ-এর আদেশ, নিষেধ এবং কথা, কাজ ও সম্মতি ইত্যাদি। এ জন্যই বলা হয় যে, কিতাব ও সুন্নাহর দলীল, অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের দলীল। তবে পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শাস্ত্রের বিদ্বানগণ স্বীয় উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ভঙ্গিতে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।[৫]

---

[২] যেমন- "সূরা নিসা- ২৬, সূরা আনফাল- ৩৮, সূরা কাহাফ- ৫৫ ইত্যাদি।

[৩] সহীহ মুসলিম- হাঃ নং ৬৭২৩।

[৪] দ্রঃ "خبر الواحد وحجيته" (৪৭-৫০) পৃঃ।

[৫] দ্রঃ خبر الواحد وحجيته - ৫১ পৃঃ।

মুহাদ্দিস তথা হাদীস শাস্ত্রবিদদের নিকট নাবী ﷺ হতে কথা, কাজ, সম্মতি এবং সৃষ্টিগত ও চারিত্রিক গুণাবলী যাহাই প্রমাণিত হয় সবই সুন্নাহ বলে পরিচিত। এই দৃষ্টিকোণ হতে অনেক মুহাদ্দিসের নিকট সুন্নাহ ও হাদীস একই বিষয়।

ফিকাহ্ শাস্ত্রের নীতিমালা তথা অসূল শাস্ত্রবিদদের নিকট নাবী ﷺ হতে কুরআন ছাড়া ইসলামের দলীল যোগ্য কথা, কাজ ও সম্মতি যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে সবই সুন্নাহ এর অন্তর্ভূক্ত।

ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদদের নিকট নাবী ﷺ হতে ফরয ও ওয়াজিব ছাড়া যে সমস্ত বিধান সাব্যস্ত হয়েছে তা সবই সুন্নাহ এর অন্তর্ভূক্ত। আবার বলা হয় যা করলে ছাওয়াব হবে কিন্তু ছুটে গেলে শাস্তি হবে না তাহাই সুন্নাহ।

বিদ্বানগণের উদ্দেশ্য ভিন্নতার কারণে সংজ্ঞার ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। উপরোক্ত সংজ্ঞা সমূহের মধ্যে মুহাদ্দিসদের সংজ্ঞাটি ব্যাপক অর্থ সম্বলিত, অর্থাৎ নাবী ﷺ হতে প্রমাণিত কথা, কাজ, সম্মতি এবং সৃষ্টিগত ও চারিত্রিক গুণাবলী সবই সুন্নাহ এর অন্তর্ভূক্ত।

অবশ্য নাবী ﷺ-এর সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত গুণাবলী সুন্নাহ এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত কিনা সে ব্যাপারে কিছু মতামত পরিলক্ষিত হয়। তাই এক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)-এর সুন্নাহর সংজ্ঞাটি যথার্থ বলে মনে হয়। তিনি বলেন[৬] :

السنة في الإصطلاح : هى ما صدر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير مما يراد به التشريع للأمة، فيخرج بذلك ما صدر عنه ﷺ من الأمور الدنيوية والجبلية التي لا دخل لها بالأمور الدينية، ولاصلة لها بالوحي.

ইসলামী পরিভাষায় সুন্নাহ : এ উম্মাতের জন্য শরীয়তের উদ্দেশ্যে নাবী ﷺ হতে যে সব কথা, কাজ ও সম্মতি প্রকাশ পেয়েছে তাকেই সুন্নাহ سنة বলা হয়। অতএব দ্বীনী বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এবং ওয়াহীর সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন সব পার্থিব ও সৃষ্টিগত বিষয় নাবী ﷺ হতে প্রকাশ হলেও তাহা সুন্নাহ এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

---

[৬] الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام লিল আলবানী (রহ.), ১৩ পৃঃ

আশা করা যায় এ সংজ্ঞাটিই যুক্তিযুক্ত ও মতভেদ মুক্ত সঠিক সংজ্ঞা। والله تعالى أعلم

সুন্নাহর আভিধানিক ও পারিভাষিক সম্পর্ক : সুন্নাহর আভিধানিক অর্থ হলো পথ ও পদ্ধতি, রীতি ও নীতি, অর্থাৎ নাবী ﷺ-এর নবুওতী জীবনের পদ্ধতি ও রীতি-নীতি। মূলতঃ মুহাদ্দিসদের নিকট সুন্নাহর সংজ্ঞার ফলাফল এটাই আসে, তাই সুন্নাহ (سنة) এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে কোন ভিন্নতা নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামী শরীয়াতে সুন্নাহর গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলাম কোন মানব রচিত জীবন ব্যবস্থা নয় বরং ইহা একটি ওয়াহী ভিত্তিক আল্লাহ প্রদত্ত ও মনোনীত জীবন ব্যবস্থা, ইসলামী শরীয়াতের মূলনীতি হলো কুরআন ও সুন্নাহ। পবিত্র কুরআন যেমন ওয়াহী প্রদত্ত সুন্নাহও তেমনি ওয়াহী প্রদত্ত, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾

"আর তিনি (নাবী ﷺ) প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না বরং শুধুমাত্র তাকে যা ওয়াহী করা হয় তাই বলেন।" [সূরা আন্-নাজম: ৩-৪]।

সুতরাং নাবী ﷺ-এর দ্বীনী কথা, কাজ ও সম্মতি সব কিছুই ওয়াহী ভিত্তিক। এ জন্যই আল্লাহর নির্দেশকে যেমন কোন ঈমানদার নর-নারীর উপেক্ষা করে চলার সুযোগ নেই। নাবী ﷺ-এর নির্দেশেরও একই অবস্থা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيناً﴾

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের নির্দেশ দিলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে কোন এখতিয়ার থাকে না, আর যে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয় সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।" [সূরা আহ্‌যাবঃ ৩৬]

এ আয়াত ইসলামী শরীয়তে সুন্নাহর গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, আল্লাহ বা কুরআনের নির্দেশের অবস্থান এবং রাসূল ﷺ বা সুন্নাহর নির্দেশের অবস্থান পাশাপাশি। অনুরূপভাবে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করলে যেমন পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ অমান্যের পরিণতিও একই কোন অংশে কম নয়। এমনকি রাসূল ﷺ-এর সিদ্ধান্ত ও সমাধানকে সতস্ফূর্তভাবে মাথা পেতে মেনে নেয়া ছাড়া কখনও ঈমানদার হওয়া সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾

"অতঃপর তোমার রবের কসম তারা কখনও ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ফায়সালাকারী হিসাবে মেনে নেয়, অতঃপর তোমার ফায়সালার ব্যাপারে তারা অন্তরে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবূল করে নিবে।"

[সূরা নিসা : ৬৫]

সুন্নাতের অনুসরণ ছাড়া যেমন ঈমানদার হওয়া সম্ভব নয়, ঈমানদার হওয়ার পর তেমনি আবার সুন্নাতের অনুসরণ ছাড়া পূর্ণ ইসলাম মানাও সম্ভব নয়। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হাসান বাসরী (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা সাহাবী ঈমারান বিন হুসাইন (রাঃ) কিছু ব্যক্তিসহ শিক্ষার আসরে বসেছিলেন। তাদের মধ্য হতে একজন বলে ফেললেন, আপনি আমাদেরকে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু শুনাবেন না। তিনি (সাহাবী) বললেন : নিকটে আস, অতঃপর বললেন, তুমি কি মনে কর, যদি তোমাদেরকে শুধু কুরআনের উপরই ছেড়ে দেয়া হয়? তুমি কি যোহরের সালাত চার রাকাআত, আসর চার রাকাআত, মাগরিব তিন রাকাআত, প্রথম দুই রাকাতে কিরাত পাঠ করতে হয় ইত্যাদি সব কুরআনে খুঁজে পাবে? অনুরূপভাবে কাবার তাওয়াফ সাত চক্কর এবং সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ ইত্যাদি কি কুরআনে খুঁজে পাবে? অতঃপর বললেন : হে মানব সকল! তোমরা আমাদের (সাহাবীদের) নিকট হতে সুন্নাহর আলোকে ঐ সব বিস্তারিত বিধি-বিধান জেনে নাও। আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা যদি সুন্নাহ্ মেনে না চল, তাহলে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।[৭]

শুধু কুরআনুল কারীমকে আঁকড়ে ধরে পূর্ণ ইসলাম মানা কখনও সম্ভব নয়, বরং এ নীতি মানুষকে পথভ্রষ্ট করে ইসলাম হতে বের করে দিবে এবং পরকালে জান্নাত পাওয়াও অসম্ভব হয়ে যাবে। সুতরাং পরকালে

---

[৭] বায়হাকী ফি মাদখালিল দালাইল- ১/২৫, আল খাতীব ফিল কিফায়াহ- ৪৮ পৃঃ, জামি বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী- ২/১৯১ পৃঃ।

জান্নাত পেতে হলে নাবী ﷺ-এর নিয়ে আসা আল্লাহর বাণী আল-কুরআনুল কারীম এবং তাঁর হাদীস বা সুন্নাহ্ উভয়েরই একনিষ্ঠ অনুসারী হতে হবে। হাদীসে এসেছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

সাহাবী আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে তবে যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে তারা ব্যতীত। জিজ্ঞাসা করা হল ঃ কারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে? তিনি বললেন : যে আমার অনুসরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমাকে অমান্য করে সেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে।[৮]

এ হাদীস স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ্ অনুসরণের কোন বিকল্প পথ নেই।

অতএব ইসলামী শরীয়াতে সুন্নাহর গুরুত্ব ও তাৎপর্য কতটুকু তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। ইহা ছাড়াও সুন্নাহর গুরুত্ব সম্পর্কে আরো কতগুলি বিষয় তৃতীয় পরিচ্ছেদে তুলে ধরা হল।

---

[৮] সহীহুল বুখারী- কিতাবুল ইতিসাম- হাঃ ৬৭৩৭।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুন্নাতুর রাসূল ﷺ ইসলামের অকাট্য দলীল

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান, আর এ ইসলামের বিধানগুলি যেমনিভাবে আল কুরআনের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয় তেমনি নাবী মুহাম্মদ ﷺ-এর সুন্নাহর মাধ্যমেও সাব্যস্ত হয়, সুতরাং সুন্নাহ্ ইসলামের অকাট্য দলীল, বিষয়টি কুরআন, হাদীস ও মুসলিম উম্মার ইজমার আলোকে নিম্নে আলোকপাত করা হল।

আল কুরআনের আলোকে : মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী ইসলামের প্রথম মূলনীতি আল কুরআনের অসংখ্য আয়াত প্রমাণ করে যে, নাবী ﷺ-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য ছাড়া ঈমান ও ইসলাম মানা সম্ভব নয়, এ প্রসঙ্গে নিম্নে কয়েকটি দিক তুলে ধরা হল :

(ক) সুন্নাতে রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য ছাড়া ঈমানদার হওয়া সম্ভব নয় :

আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

"তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।"

[সূরা আন্‌ফাল : ১]

এখানে রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের আনুগত্য করার কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং কোন ঈমানদার ব্যক্তির রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতকে এড়িয়ে চলার কোন সুযোগ নেই।

(খ) সুন্নাতে রাসূল বর্জন করা কুফরী কাজ :

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾

"বলুন আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, আর যদি তারা পলায়ন করে, তাহলে আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না।" [আলি 'ইমরান : ৩৩]

রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য হতে পলায়ন করা অর্থাৎ তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ বর্জন করা, ইহা প্রকাশ্য কুফরী।

(গ) করণীয় ও বর্জনীয় ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-ই একমাত্র মাপকাঠি :

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক, আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা।" [সূরা আল হাশর : ৭]

এ আয়াতে রাসূল ﷺ-এর দেয়া অর্থ হলো রাসূল ﷺ ইসলামের যে সব বিধি-বিধান দিয়েছেন, অর্থাৎ কুরআন এবং হাদীস, যেমন নাবী ﷺ বলেন,

إِنِّيْ أُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

"আমাকে কিতাব (কুরআন) এবং উহার অনুরূপ (সুন্নাহ্) দেয়া হয়েছে।"[১] আর এ দুটিই তিনি ﷺ তাঁর উম্মাতকে দিয়েছেন।

(ঘ) কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমেই কেবল মাত্র দ্বন্দের সমাধান হতে হবে :

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

"যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে পড়, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণ কর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" [সূরা নিসা : ৫৯]

---

[১] আবু দাউদ- হাঃ নং ৪৬০৪, তিরমিযী- হাঃ নং ২৬৬৪। (সহীহ)

ইমাম তাবারী (রহ.) বলেন : আয়াতের অর্থ হলো যখন তোমাদের মাঝে কোন ধর্মীয় বিষয়ে বিবাদ পরিলক্ষিত হবে, তখন তার সমাধান ও ফয়সালা হলো একমাত্র আল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব কুরআন এবং রাসূল ﷺ অর্থাৎ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে এবং তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর সুন্নাতের মাধ্যমে।[১০]

এ আয়াতের শিক্ষা হল আমরা যদি সত্যিকার আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমানদার হই তাহলে আমাদের মাঝে ধর্মীয় বিবাদের সমাধান কোন ইমাম, পীর, দরবেশ, মত ও পথের মাধ্যমে না হয়ে হতে হবে একমাত্র আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর সহীহ সুন্নাহর মাধ্যমে।

(৬) আল্লাহকে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ হলো সুন্নাহর অনুসরণ :

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দিবেন, আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।"

[সূরা আলু ঈমরান : ৩১]

এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত যা বিদ্বানদের নিকট آيَةُ الإِمْتِحَان বা পরীক্ষার আয়াত বলে পরিচিত। ইমাম আব্দুর রহমান মুবারকপরী (রহ.) বলেন, এ আয়াত হতে সাব্যস্ত হয় যে, যে ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর হাদীস অনুসরণ করে না এবং সে অনুযায়ী আমল করা ওয়াজীব মনে করে না, সে আল্লাহকে ভালবাসার মিথ্যুক দাবীদার। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসায় মিথ্যুক প্রমাণিত হয়, সে মূলতঃ আল্লাহর প্রতি ঈমানের মিথ্যুক দাবীদার।[১১]

অতএব সত্যিকার ঈমানদার ও আল্লাহর প্রিয় হতে হলে সকল গাউছ-কুতুব, পীর-দরবেশ ও ওলী-আওলীয়াকে বাদ দিয়ে একমাত্র নাবী ﷺ-এর সুন্নাতের অনুসারী হতে হবে।

---

[১০] তাফসীর তাবারী- সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ (সংক্ষিপ্ত)।

[১১] مقدمة تحفة الأحوذي ২১ পৃঃ।

(চ) সুন্নাহর বিরোধীতা হলে ফিৎনা ও যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সম্মুখীন হতে হবে :

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা যেন সতর্ক হয় যে, তাদেরকে ফিতনা পেয়ে যাবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।" [সূরা নূর : ৬৩]

অতএব ইহকাল ও পরকালে ফিৎনা ও শাস্তি হতে রক্ষা পেতে হলে সুন্নাহ অনুসরণের বিকল্প কোন পথ নেই।

(ছ) মুসলিম উম্মার উত্তম আদর্শের প্রতিক রাসূল ﷺ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا﴾

"তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মাঝেই রয়েছে উত্তম আদর্শ, এটা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।" [সূরা আহ্যাব : ২১]

ইমাম ইবনে কাছীর (রহ.) বলেন : "নাবী ﷺ-এর অনুসরণের বিষয়ে এ আয়াতটি একটি অকাট্য ও বড় ধরণের প্রমাণ ----।"[১২]

নাবী ﷺ-এর সুন্নাহ ইসলামী নীতিমালার এক অবিচ্ছেদ অংশ, যা ছাড়া ইসলাম কখনও পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, সন্নাহ ইসলামের এক একাট্য দলীল এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে, নমুনা স্বরূপ সামান্য কিছু উপস্থাপন করা হল, এখন আমরা নাবী ﷺ-এর হাদীসের আলোকে বিষয়টি জানার চেষ্টা করি।

হাদীসের আলোকে : সুন্নাতুর রাসূল ﷺ ইসলামী শরীয়াতের আকাট্য দলীল কুরআনের আলোকে প্রমাণিত হওয়ার পর এ বিষয়ে

[১২] তাফসীর ইবনে কাছীর সূরা আহ্যাব ২১ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য- ৩/৫২২ পৃঃ।

হাদীসের অবতারণার প্রয়োজন হয় না বরং ইসলামের কোন বিধান প্রমাণের জন্য একটি বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট দলীলই যথেষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু পাঠক সমাজের কাছে বিষয়টি আরো স্পষ্ট ও আলোকিত হওয়ার জন্য "সুন্নাতুর রাসূল ﷺ ইসলামী শরীয়াতের অকাট্য দলীলের" প্রমাণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

(ক) প্রসিদ্ধ সাহাবী জাবির বিন আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নাবী ﷺ-এর ঘুমন্ত অবস্থায় কিছু সংখ্যক ফিরিস্তা আসলেন, তাদের কেউ বললেন, তিনি ঘুমন্ত, আবার কেউ বললেন : তাঁর চক্ষু ঘুমন্ত কিন্তু অন্তর জাগ্রত। অতঃপর তারা বললেন, তাঁর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে তোমরা সে দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর, অতঃপর বললেন, তাঁর দৃষ্টান্ত হল ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সুসজ্জিত করে একটি গৃহ নির্মাণ করল, অতঃপর সেখানে খাওয়ার আয়োজন করল এবং একজন আমন্ত্রণকারী প্রেরণ করল, অতঃপর যে আমন্ত্রণ গ্রহণ করল, গৃহে প্রবেশ করল এবং আয়োজিত খানা খেল। আর যে আমন্ত্রণ গ্রহণ করল না, গৃহেও প্রবেশ করল না এবং আয়োজিত খানাও খেল না। এ দৃষ্টান্ত বর্ণনার পর তারা বললেন : দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা করে দিন তিনি (নাবী ﷺ) বুঝতে পারবেন, কারণ চক্ষু ঘুমন্ত হলেও অন্তর জাগ্রত, তখন তারা ব্যাখ্যায় বললেন :

فَالدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ ﷺ فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمُحَمَّدٌ ﷺ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ

"নির্মিত গৃহটি হল জান্নাত, আর আমন্ত্রণকারী হলেন মুহাম্মদ ﷺ, অতএব যে ব্যক্তি মুহাম্মদ ﷺ-এর আনুগত্য স্বীকার করে, সে যেন প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'আলরই আনুগত্য স্বীকার করল। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মদ ﷺ-কে অমান্য করল, সে যেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলাকেই অমান্য করল। মুহাম্মদ ﷺ হলেন মানুষের মাঝে (ন্যায় ও অন্যায়ের) পার্থক্যকারী।[১৩]

---

[১৩] সহীহুল বুখারী হাঃ নং- ৬৭৩৮।

(খ) সাহাবী আল ঈরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন :

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (أحمد، أبو داود، الترمذى وإبن ماجة) قال الترمذى حديث حسن صحيح.

একদা রাসূল ﷺ আমাদের সালাত পড়ালেন, অতঃপর সালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ করে বসে হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য শুনালেন, বক্তব্য শুনে আমাদের চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে গেল এবং হৃদয়ে কম্পন শুরু হল, আমরা আবেদন করলাম হে রাসূলুল্লাহ! মনে হয় ইহা যেন বিদায়ী ভাষণ, অতএব আমাদেরকে কিছু উপদেশ দিন! তখন রাসূল ﷺ বললেন : আমার উপদেশ হল তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের (ধর্মীয় নেতার) আনুগত্য স্বীকার কর এবং তার কথা শ্রবণ কর, যদিও হাব্‌শী কৃতদাস তোমাদের নেতা হয়ে থাকে। জেনে রেখ তোমাদের মধ্য হতে আমার পরে যে বেঁচে থাকবে সে (দ্বীনী বিষয়ে) বহু মতভেদ দেখতে পাবে, এমতাবস্থায় তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য হলো আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর এবং সুপথ প্রাপ্ত আমার (চার) খোলাফায়ে রাশিদার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর। আর সাবধান থাক (দ্বীনের নামে) নব আবিস্কৃত বিষয়সমূহ হতে! কারণ প্রতিটি (দ্বীনের নামে) নব আবিস্কৃত বিষয় হল বিদ'আত, আর সকল প্রকার বিদ'আত হলো পথভ্রষ্টতা।[১৪]

এ মূল্যবান হাদীসটি হতে আমরা একাধিক বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, প্রথমত : ইহা প্রমাণ করে যে, সুন্নাতুর রাসূল ﷺ ইসলামী শরীয়তের অকাট্য দলীল, অতএব আঁকড়ে ধরতেই হবে উপেক্ষা করার কোন সুযোগ নেই। দ্বিতীয়ত : সুন্নাহ এর বিপরীত বিষয় হলো বিদ'আত,

[১৪] আবু দাউদ– হাঃ নং- ৪৬০৭, তিরমিযী- হাঃ ২৬৭৬, ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

বিদ'আতের পরিচয় হল : ইসলামে ইবাদাতের নামে এমন কোন নতুন বিষয়, অথবা মূল বিষয়ের কোন সংযোজন চালু করা যা কুরআন ও সুন্নায় প্রমাণিত নয়। এরূপ সকল বিদ'আতই ইসলামে গর্হিত ও পরিত্যাজ্য, কারণ আলোচ্য হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ "সকল প্রকার বিদ'আত পথভ্রষ্টতা" অন্য বর্ণনায় এসছে كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ "সকল প্রকার বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা, আর সকল পথভ্রষ্টতার পরিণতি হলো জাহান্নাম।" অতএব মনের খেয়াল খুশী অনুযায়ী বিদ'আতকে ভাগাভাগি করার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ্ আমাদের নাবী ﷺ-এর সুন্নাতকে পূর্ণভাবে আঁকড়ে ধরে এবং সকল প্রকার বিদ'আত বর্জন করে সঠিক ইসলাম মেনে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন!

(গ) সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي

"তোমাদের মাঝে দু'টি বিষয় রেখে গেলাম যতক্ষণ সে দু'টি আঁকড়ে ধরে থাকবে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না, আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও আমার সুন্নাত"।[১৫]

এ হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, নাবী ﷺ বিদায় হজ্জে লক্ষাধিক জনতার সামনে জীবনের শেষ হজ্জে শেষ ভাষণে শেষ উপদেশ প্রদানকালে বলেন : আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর সুন্নাতই হল সুপথ ও বিপথের মাপকাঠি, এ দু'টিকে সমানভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। শুধু কুরআনকে আঁকড়ে ধরে যেমন সুপথ হতে পারে না, তেমনি শুধু সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরেও সুপথ হতে পারে না। তাই কুরআন ও সুন্নাহ উভয়কে সমানভাবে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে কেবল মানুষ তার দ্বীনকে সংরক্ষণ করতে পারবে, নচেত কখনও সম্ভব নয়।

সুন্নাহ ইসলামী শরীয়াতের অকাট্য দলীল প্রমাণ করার জন্য নমুনা স্বরূপ এ তিনটি হাদীস উপস্থাপন করেই শেষ করতে চাই, মূলতঃ এ বিষয়ে অসংখ্য সহীহ হাদীস রয়েছে যা তুলে ধরলে ছোটখাট একখানা পুস্তক হয়ে যাবে।

[১৫] মুয়াত্তা ইমাম মালিক- হাঃ ১৩৯৫, হাকিম- সহীহ হাঃ ২৯১।

ইজমার আলোকে : সুন্নাতুর রাসূল ﷺ ইসলামী শরীয়াতের অকাট্য দলীল, যা পবিত্র কুরআনের আলোকে অতঃপর হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হল। উক্ত আলোচনা হতে এটাই সুস্পষ্ট হয় যে, কোন ঈমানের দাবিদার সুন্নার অনুসরণ হতে দূরে থাকতে পারে না এবং কুরআন ও সুন্নাহর উর্ধ্বে কোন কিছুকে প্রাধান্য দিতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অগ্রে কোন কিছু প্রাধান্য দিও না, আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।" [সূরা আল হুজরাত : ১]

অতএব কোন ঈমানদার আল্লাহভীরু জ্ঞানীব্যক্তি সুন্নাহবিরোধী হতে পারে না। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কিতাবুল উম্মে বলেন :

(لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم، يخالف في أن فرض الله عزوجل اتباع أمر رسول الله ﷺ والتسليم لحكمه بأن الله عزوجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه)

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ এর পূর্ণ অনুসরণ করা এবং তাঁর ফায়সালা মাথাপেতে মেনে নেয়া যে ফরয করে দিয়েছেন এ বিষয়ে কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে দ্বিমত পোষণ করতে আমি শুনিনি। কারণ আল্লাহ তা'আলা নাবী ﷺ-এর পরবর্তী কোন ব্যক্তির জন্য তাঁর অনুসরণের বিকল্প পথ রাখেন নি।"[১৬]

অতএব নাবী ﷺ-এর সুন্নাহ ইসলামের অকাট্য দলীল ও অনুসরণীয় হওয়াতে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ইজমা বা ঐক্যমত পোষণ করেছেন।[১৭]

---

[১৬] কিতাবুল উম্ম- ৭/২৭৩ পৃঃ।

[১৭] দ্রঃ مكانة السنة في الإسلام (৯৭-১০১) পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আল-কুরআনের সাথে সুন্নাহর সম্পর্ক

কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা'আলার বাণী যা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে নাবী (ﷺ)-এর কাছে ওয়াহী হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। অপর পক্ষে রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহ আল্লাহ তা'আলার বাণী না হলেও তা ওয়াহী হতে মুক্ত নয়, বরং তাও ওয়াহী এর অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ তা'আলাই সে স্বীকৃতি দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾

"আর তিনি (ﷺ) প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না বরং যা ওয়াহী করা হয় তাই বলেন।" [সূরা আন-নজম : ৩-৪]

অতএব আল কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে তেমন কোন দূরত্ব নেই বরং ওয়াহীর সূত্রে এক অপরের সাথে সম্পৃক্ত ও পরিপূরক। তাইতো নাবী (ﷺ) বলেন : إِنِّيْ أُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

"আমাকে কিতাব (কুরআন) এবং উহার সাথে অনুরূপ (সুন্নাহ) দেয়া হয়েছে।"[১৮] সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর সম্পর্ক হল অতি গভীর। এ বিষয়টি আলোকপাত করতে গিয়ে ইসলামী গবেষকগণ সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেন যে, কুরআনের সাথে সুন্নাহর সম্পর্কের তিনটি অবস্থা রয়েছে।[১৯]

প্রথম অবস্থা : কুরআন ও সুন্নাহর হুবহু মিল থাকবে। যেমন- হাদীসে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً

---

[১৮] আবূ দাউদ হাঃ ৪৬০৪ (সহীহ)।

[১৯] خبر الواحد وحجيته (৬৩-৮৩) পৃঃ। مكانة السنة في الإسلام (১১১-১৪০) পৃঃ।

সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি হল পাঁচটি- (১) সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য প্রদান করা যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার রাসূল। (২) সালাত কায়েম করা, (৩) যাকাত আদায় করা, (৪) রমাযান মাসে সাওম পালন করা এবং (৫) সামর্থ্যবান ব্যক্তির বাইতুল্লায় হাজ্জ সম্পদান করা।[২০]

হাদীসের আলোচ্য বিষয়গুলি হুবহু কুরআনুল কারীমেও এসেছে : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

"তোমরা সলাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর।" [সূরা আল-বাকারাহ্ : ৮৩]

তিনি আরো বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾

"হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর (রমাযান মাসের) রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল।"

[আল-বাকারাহ্ : ১৮৩]

তিনি আরো বলেন :

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

"আল্লাহর উদ্দেশ্যে (কাবা) গৃহে হাজ্জ সম্পাদন করা সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের অপরিহার্য কর্তব্য।" [আল-ঈমরান : ৯৭]

সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমার (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে যেমন সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্জ মৌলিকভাবে আলোচিত হয়েছে ঠিক তেমনি কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহে উক্ত বিষয়গুলি মৌলিকভাবে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে এ ক্ষেত্রে হুবহু মিল রয়েছে।

[২০] সহীহুল বুখারী- ১/১০ পৃঃ হাঃ ৭, সহীহ মুসলিম- হাঃ ২১।

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ দ্বিতীয় অবস্থা হল সুন্নাহ কুরআনের মুতলাক (সাধারণ) হুকুমকে মুকাইয়াদ (সীমাবদ্ধ) হিসেবে, মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) হুকুমকে মুফাস্‌সাল (বিস্তারিত) হিসেবে এবং 'আম (ব্যাপক) হুকুমকে খাস (নির্দিষ্ট) হিসেবে বর্ণনা করে থাকে। যেমন- সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, পারস্পারিক আদান-প্রদান ও বেচা-কেনা ইত্যাদি বিষয়গুলি সংক্ষিপ্তভাবে কুরআনে এসেছে, কিন্তু তা নাবী ﷺ-এর হাদীসে বিস্তারিত আকারে আলোচিত হয়েছে। মূলতঃ অধিকাংশ হাদীসই হল কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনার ক্ষেত্র। পাঠকের কাছে এ বিষয়টি আরো পরিস্কার হওয়ার জন্য নিম্নে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল।

(১) কুরআনের মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) বিষয়গুলি সুন্নাহ মুফস্‌সাল (বিস্তারিত) ভাবে বর্ণনা দিয়েছে।

ইমাম মারওয়াযী (রহ.) বলেন : ইসলামের ফরয মূলনীতিগুলো নাবী ﷺ-এর সুন্নাহর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছাড়া তা জানা ও আমল করা কখনও সম্ভব নয়, যেমন- সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ও জিহাদ ইত্যাদি।[২১]

(ক) পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾

"তোমরা সলাত কায়েম কর।" [সূরা আল-বাকারাহ্ : ৮৩]

এখানে মুজমাল (সংক্ষিপ্ত)ভাবে সালাত কায়েমের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বর্ণনা করা হয়নি তার নির্দিষ্ট সময়গুলি, নির্দিষ্ট রাকাআতের সংখ্যাগুলি ও আরো অন্যান্য বিষয়গুলি। কিন্তু এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন নাবী ﷺ তাঁর হাদীসে। ফরয সালাতের সময় কখন, যোহরের সময় কখন, আসর, মাগরিব ও এশার সময় কখন? কোন সালাত কত রাকাআত, সুন্নাত ও ফরয কত রাকাআত? জুমআর সালাত কি নিয়মে, ঈদের সালাত কি নিয়মে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত কি নিয়মে? সুন্নাত সালাত কি নিয়মে? রুকু, সিজ্‌দা ও তাশাহহুদ কি নিয়মে এবং কখন কোন কিরাআত ও দু'আ পাঠ করতে হবে ইত্যাদি সব বিষয়গুলি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন নাবী ﷺ তাঁর সুন্নাহর মধ্যে, এমনকি বাস্তব চিত্র

---

[২১] السنة للمروزي পৃ: ৩১।

তুলে ধরে তাহা অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি বলেন : ﴿صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي﴾ "তোমরা ঠিক সেই নিয়ম পদ্ধতিতে সালাত সম্পাদন কর, যেভাবে আমাকে সম্পাদন করতে দেখেছ।"[২২]

(খ) আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন : ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

"তোমরা যাকাত আদায় কর।" [সূরা আল-বাকারাহ্ : ৮৩]

এখানে শুধু যাকাত আদায় এর বিধান মুজমাল (সংক্ষিপ্ত)ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু কোন্ কোন্ সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে? কোন্ সময়ে ও কোন্ নিয়মে তা বিস্তারিত কোন বর্ণনা কুরআনুল কারীমে আসেনি, বরং এ সমস্ত মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) বিধান মুফাস্‌সাল (বিস্তারিত)ভাবে এসেছে নাবী ﷺ-এর হাদীসে। কোন্ কোন্ সম্পদের যাকাত দিতে হবে এবং কি পরিমাণ সম্পদে, কোন সময় ও নিয়মে যাকাত দিতে হবে সবই স্ববিস্তারে নাবী ﷺ তাঁর সুন্নায় বর্ণনা করেদিয়েছেন। যেমন- তিনি বলেন :

لَيْسَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِيْنَ مِنَ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ.

"৫২.৫ তলার কম রৌপ্য হলে কোন যাকাত নেই, ২০ মনের কম ফসল হলে কোন যাকাত নেই, পাঁচটি উটের কম হলে কোন যাকাত নেই, ছাগল ৪০টির কম হলে কোন যাকাত নেই, গুরু ৩০টির কম হলে কোন যাকাত নেই।" (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)। ইত্যাদি যাকাতের খুঁটিনাটি সব বিধান বিস্তারিতভাবে সুন্নাহয় বর্ণনা করা হয়েছে।

(গ) আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন :

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾

"তোমাদের উপর রমাযানের রোযা ফরয করা হয়েছে।" [সূরা আল-বাকারাহ্ : ১৮৩]

কিন্তু রমাযান মাস কিভাবে শুরু হবে? সাওম অবস্থায় কি কি নিষিদ্ধ? ফরয সাওমের নিয়ম কি? নফল সাওমের নিয়ম কি? ইত্যাদি বিষয়গুলি

[২২] সহীহ বুখারী, হাঃ নং ৬৩১।

বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি, পক্ষান্তরে সাওম সম্পর্কীয় যাবতীয় বিধি-বিধান যেমন- চাঁদ দেখেই সাওম শুরু করতে হবে আবার চাঁদ দেখেই সাওম শেষ হবে, এবং কি করলে সাওম সুন্দর হয়, কি করলে নষ্ট হয় ইত্যাদি বিষয়গুলি স্ববিস্তারে সুন্নায় আলোচনা করা হয়েছে।

(ঘ) আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন :

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

"আল্লাহর নির্দেশে সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের কাবা গৃহে হাজ্জ সম্পাদন করা অবশ্য কর্তব্য।" [সূরা আল-ঈমরান : ৯৭]

হাজ্জের বিধান কুরআন মাজিদে মুজমাল (সংক্ষিপ্ত)ভাবে এসেছে, এর বিস্তারিত বর্ণনা যেমন- কোথা হতে ইহরাম বাঁধবে, কিভাবে ইহরাম বাঁধবে, হাজ্জের দিনগুলিতে মক্কায়, মিনায়, আরাফায় কি কি কাজ করতে হবে তা কুরআন মাজিদে স্ববিস্তারে আলোচনা করা হয়নি বরং নাবী ﷺ-এর সুন্নায় সকল ক্ষেত্রের সকল সুন্নাত, ওয়াজিব ও ফরযসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এ জন্যই নাবী ﷺ হজ্জের সকল কর্মক্ষেত্রে সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন : خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ "তোমরা আমার নিকট হতে তোমাদের হাজ্জের বিধি-বিধান শিখে নাও।"[২৩]

অতএব এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে প্রতিয়মান হল যে, কুরআন ও সুন্নাহর গভীর সম্পর্ক হলো- কুরআন এর বিস্তারিত রূপদানকারী হচ্ছে সুন্নাহ্। সুন্নাহ্ ব্যতীত কুরআনকে ভালভাবে জানা ও মানা সম্ভব নয়।

(২) কুরআনের মুতলাক (সাধারণ) বিষয়গুলি সুন্নাহ্ মুকাইয়াদ (সীমাবদ্ধ) করে বর্ণনা করেছে।

অর্থাৎ কুরআনুল কারীমে কতকগুলি বিধান এমন সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে কোন রকম সীমা বা নির্ধারিত পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি ফলে কার্যক্ষেত্রে তা পালন করা বা মেনে চলা কঠিন হয়ে যায়, এমন বিষয়গুলি সুন্নাহর মাধ্যমে মুকাইয়াদ বা সীমাবদ্ধ ও নির্ধারিত পরিমাণে করে দেয়া হয়েছে। যার ফলে কার্যক্ষেত্রে তা খুবই সহজসাধ্যে পরিণত হয়েছে।

---

[২৩] সহীহ মুসলিম হাঃ নং-১২৯৭।

(ক) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾

"তোমরা তোমাদের চেহারা ও দুই হাত তা (মাটি) দ্বারা মাসাহ্ কর।"

[সূরা আল-মায়িদা : ৬]

কুরআনে তায়াম্মুমের বিধানে দুই হাত মাসাহ্র বিষয়টি মুতলাক (সাধারণ)ভাবে রেখে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ কোন সীমা বা নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং এখানে হাত দ্বারা আঙ্গুলের মাথা হতে কাঁধ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশকে বুঝাবে। পক্ষান্তরে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ্ উক্ত অসীম ও অনির্দিষ্ট পরিমাণকে সীমাবদ্ধ (মুকাইয়্যাদ) করে দিয়েছে। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এসেছে, একদা এক ব্যক্তি ওমার (رضي الله عنه)-এর নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমার গোসল ফরয হয়ে গেছে কিন্তু আমি পানি পাচ্ছি না এমতাবস্থায় কি করব? তখন আম্মার বিন ইয়াসির (رضي الله عنه) ওমারকে (رضي الله عنه) বললেন : আপনার কি আমাদের ঐ ঘটনা স্মরণ হচ্ছে না, যখন আপনি এবং আমি এক সাথে সফরে ছিলাম (পানি না পাওয়ায়) আপনি সালাত আদায় করলেন না, আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম অতঃপর (এর মাধ্যমে পবিত্র হয়ে) সালাত আদায় করলাম। নাবী ﷺ-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে ঘটনা খুলে বললে তিনি বললেন : না তোমরা যেরূপ করেছ তা ঠিক হয়নি বরং এরূপ করাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল বলে তিনি ﷺ স্বীয় দুই হাত মাটিতে মারলেন, তাতে ফুঁ দিলেন, অতঃপর দুই হাত দিয়ে চেহারা এবং দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসাহ্ করলেন।"[২৪]

আয়াতে মুতলাকভাবে বর্ণিত হাত মাসাহের বিধানকে সুন্নাতুর রাসূল ﷺ মুকাইয়্যাদ (সীমিত) করে বর্ণনা দিয়েছে। অর্থাৎ তায়াম্মুমে হাত মাসাহের পরিমাণ হল কব্জি পর্যন্ত যা কুরআনের বর্ণনায় উল্লেখ নেই।

(খ) কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾

"পুরুষ ও নারী যারা চুরি করে তোমরা তাদের হাত কেটে ফেল।"

[সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৩৮]

---

[২৪] সহীহুল বুখারী- ১/৪৪৩ পৃঃ, তাফসীরে কুরতুবী- ৫/২৩৯ পৃঃ, সহীহ মুসলিম- নববী, ৪/৬১ পৃঃ।

কুরআন মাজীদে হাত কাটার বিধানটি মুতলাক (সাধারণ) বা অনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। হাত দ্বারা কোনটি উদ্দেশ্য ডান না বাম? কতটুকু পরিমাণ কব্জি পর্যন্ত, না কনুই পর্যন্ত, না কাঁধ পর্যন্ত? তা সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়নি, বরং সুন্নাতে রাসূল ﷺ চোরের হাত কাটার বিধানটিকে মুকাইয়্যাদ (সীমাবদ্ধ) ও নির্দিষ্ট করে বর্ণনা দিয়েছে।

সুতরাং কুরআনের মুতলাক বিষয়সমূহ যা পালন করা কঠিন হয়ে যায় সেগুলি সুন্নাতুর রাসূল ﷺ মুকাইয়্যাদ (সীমাবদ্ধ)ভাবে বর্ণনা দিয়ে মানুষের জন্য পালনে সহজ সাধ্য করে দিয়েছে।

(৩) কুরআনের 'আম (ব্যাপক) বিধানগুলি সুন্নাহ্ খাস (নির্দিষ্ট) করে বর্ণনা দিয়েছে। অর্থাৎ কুরআনুল কারীমে অনেক বিধি-বিধান 'আম (ব্যাপক)ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা কার্যক্ষেত্রে পালন করা দুঃস্কর হয়ে যায় ঐ সব 'আম বিধানগুলিকে নাবী ﷺ-এর সুন্নাহ্ খাস অর্থাৎ আমলের পরিধিকে নির্দিষ্ট করে বর্ণনা দিয়েছে, যা মানুষের জন্য পালনে খুবই সহজসাধ্য হয়ে গেছে। কুরআনের এরূপ বিধানকে মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা খাস বা নির্দিষ্টকরণে সকল আলিম সমাজ একমত। আর খবরে ওয়াহিদ হাদীস দ্বারও কুরআনের আম হুকুমকে খাস করা যায় এটাই প্রসিদ্ধ চার ইমামের মত বলে উল্লেখ করেছেন ইমাম সাইফুদ্দীন আল আমেদী স্বীয় আল ইহ্‌কাম গ্রন্থে।[২৫]

পবিত্র কুরআনের আম (ব্যাপক) হুকুমকে সহীহ সুন্নাহর দ্বারা খাস (নির্দিষ্ট) করার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হল :

(ক) আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾

"আর তা ছাড়া (বাকী সকল নারীদেরকে বিবাহ করা) তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।" [সূরা আন্-নিসা: ২৪]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আলুসী বলেন : "এ আয়াতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, পূর্ববর্তী আয়াতে যে সমস্ত নারীদের বিবাহ করতে নিষেধ

---

[২৫] আল ইহ্‌কাম লিল আমিদী- ২/২২ পৃঃ।

করা হয়েছে তারা ব্যতীত অন্য সকল নারীকে পৃথক পৃথক অথবা একসাথে বিবাহ করা বৈধ।"[২৬]

অতএব কুরআনুল কারীমের এ হুকুমটি হল আম বা ব্যাপক যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উল্লেখিত ব্যক্তি ও নিয়ম ছাড়া অন্য সকল ব্যক্তি (নারী) ও নিয়মে বিবাহ করা বৈধ। মূলতঃ এ ব্যাপক হুকুমে বৈধ হলেও হাদীস দ্বারা একটি বিশেষ হুকুমকে নির্দিষ্ট করে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু হুরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا "রাসূল ﷺ কোন মহিলাকে তাঁর ফুপীসহ এবং কোন মহিলাকে তার খালা সহ একত্রে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।"[২৭]

সুতরাং এ হাদীস দ্বারা কুরআনের ব্যাপক বৈধতা হুকুমের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট হুকুমকে অবৈধ বলে খাস করা হল। এ হাদীস না হলে কুরআনের আম (ব্যাপক) হুকুমের দ্বারা কোন মহিলাকে তার ফুপীসহ এবং কোন মহিলাকে তার খালাসহ একত্রে বিবাহ করা বৈধ ছিল। কিন্তু হাদীস সে ব্যাপকতার মধ্য হতে এ খাস (নির্দিষ্ট) হুকুমটিকে অবৈধতার বিধান দিয়েছে। কারণ হাদীসও আল্লাহ তা'আলার ওহীর অন্তর্ভুক্ত।

অতএব প্রমাণিত হয় সুন্নাহ্ হলো কুরআনের পরিপূরক, সুন্নাহ ছাড়া শুধু কুরআন দ্বারাই ইসলাম পূর্ণভাবে মানা সম্ভব নয়।

(খ) আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর অংশের সমান।"

[সূরা নিসা : ১১]

এ আয়াতের ব্যাপক ভাষা হতে বুঝা যায় যে, প্রতিটি পিতা-মাতা স্বীয় সন্তানদেরকে রেখে যাওয়া সম্পদের ওয়ারিছ বানাতে পারে। অনুরূপভাবে সকল প্রকার সন্তান পিতা-মাতার সম্পদের ওয়ারিছ হতে

[২৬] তাফসীর রুহুল মা'আনী- ৫/০৪ পৃঃ।

[২৭] সহীহুল বুখারী- হাঃ নং ৪৭১৭, ৯/১৬০ পৃঃ, মুসলিম- হাঃ নং ১৪০৮।

পারে। মূলতঃ হাদীস উক্ত আম (ব্যাপক) বিষয়টিকে খাস (নির্দিষ্ট) করে দিয়েছে, অর্থাৎ শুধু পিতা হলেই সন্তানকে ওয়ারিছ বানাতে পারবে না, অনুরূপ সন্তান হলেই পিতা-মাতার ওয়ারিছ হতে পারবে না, বরং কতগুলো বাঁধা রয়েছে, সে সব বাঁধামুক্ত পিতা-পুত্ররাই শুধু ওয়ারিছ বানাতে পারবে এবং ওয়ারিছ হতে পারবে। পবিত্র কুরআনে উক্ত বাঁধাসমূহ আলোকপাত করা হয়নি বরং রাসূল ﷺ-এর হাদীসে উক্ত বাঁধাসমূহ আলোকপাত করা হয়েছে, বাঁধাসমূহ নিম্নরূপ :

১. রিসালাত : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : لَا نُوْرِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ "আমরা (নাবী-রাসূল) কাউকে কোন ওয়ারিছ বানাই না বরং যা রেখে যাই তা সাধারণ দান (হিসাবে বাইতুল মালে জমা হবে)।"।[২৮] অর্থাৎ নাবী-রাসূলগণ কাউকে ওয়ারিছ বানান না এবং তাঁদের পরিত্যাক্ত সম্পদের কেউ ওয়ারিছ হওয়ার দাবী করতে পারে না।

২. ধর্মের ভিন্নতা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "কোন মুসলমান কাফির এর ওয়ারিছ হতে পারে না অনুরূপভাবে কোন কাফির মুসলমানের ওয়ারিছ হতে পারে না।"[২৯] অর্থাৎ সন্তান যদি মুসলমান হয় তাহলে কাফির পিতার ওয়ারিছ হতে পারবে না, অথবা সন্তান যদি কাফির হয় তাহলে মুসলমান পিতার ওয়ারিছ হতে পারবে না, অনুরূপভাবে পিতা-মাতাও সন্তানদের ওয়ারিছ বানাতে পারবে না।

৩. হত্যা ঘটিত কারণ : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا "হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির কোন সম্পদের ওয়ারিছ হতে পারবে না।"[৩০] অর্থাৎ হত্যাকারী যদি সন্তান হয় আর নিহত ব্যক্তি যদি পিতা-মাতা হয় তাহলে হত্যাকারী সন্তান স্বীয় পিতা-মাতার পরিত্যাক্ত সম্পদের ওয়ারিছ হতে পারবে না।

---

[২৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭২৬, সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১৭৬০।
[২৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭৪৬, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬১৪।
[৩০] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৫৬৪, ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ২৭৩৫। দ্রঃ মুখতাসারুল ফিক্বহ আল ইসলামী- পৃঃ ৭১৬।

অতএব পবিত্র কুরআনে পিতা-মাতাকে স্বীয় সন্তানদের ওয়ারিছ বানানোর যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে বিধানটি আম (ব্যাপক), যা হতে হাদীসে উল্লেখিত তিনটি বিষয়- রিসালাত, ধর্মের ভিন্নতা ও হত্যা খাস, অর্থাৎ ইহা ওই আম হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবে না। এ তিনটি ক্ষেত্রে কোন পিতা-মাতার অঢেল সম্পদ থাকলেও স্বীয় সন্তানদের ওয়ারিছ বানাতে পারবে না।

(গ) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾

"যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও"। [সূরা আল-মায়িদাহ : ৩৮]

এ আয়াতে চুরি করা বা চোর শব্দটি আম (ব্যাপক) ভাবে এসেছে, অর্থাৎ চুরি করলেই তার হাত কাটতে হবে। চাই নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ চুরি করুক বা তার চেয়ে কম করুক, অনুরূপভাবে সংরক্ষিত সম্পদ হতে চুরি করুক বা অসংরক্ষিত সম্পদ হতে চুরি করুক, মোট কথা কুরআনের আয়াতে এমন আম বা ব্যাপকভাবে নির্দেশ এসেছে যাতে প্রমাণিত হয় যে, যে কোন চোর যে ভাবেই চুরি করুক না কেন সকল ক্ষেত্রে সকল চোরের হাত কাটতে হবে। মূলতঃ এ ব্যাপক (আম) বিধানটি রাসূল ﷺ-এর হাদীসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট (খাস) হয়। অর্থাৎ শুধুমাত্র ওই চোরের হাত কাটা হবে, যে সংরক্ষিত ও নির্ধারিত পরিমান সম্পদ চুরি করে।

রাসূল ﷺ বলেন : لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا

"এক চতুর্থাংশ দিনার সমপরিমাণ বা ততোধিক সম্পদ চুরি করা ছাড়া কোন চোরের হাত কাটা যাবে না।"[৩১]

পবিত্র কুরআনের নির্দেশে চুরিকরা মালের পরিমাণ অনির্দিষ্ট থাকলেও রাসূল ﷺ স্বীয় হাদীসে তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি ১/৪ (সিকি) দিনার এর কম পরিমাণ সম্পদ চুরি করে তাহলে তার হাত কাটা যাবে না। অনুরূপভাবে কুরআনের নির্দেশে সম্পদ সংরক্ষিত বা অসংরক্ষিত কোন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় নাই, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

---

[৩১] সহীহ মুসলিম, ৫/১১২ পৃঃ হাঃ ৩১৯০।

... وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يَأْوِيَهُ الْجَرِينَ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ......"

যে ব্যক্তি ফসল সংরক্ষণ করার পর চুরি করে, আর চুরিকৃত সম্পদ ঢালের সমমূল্য হয় তাহলে ওই চোরের হাত কাটা হবে।"[৩২]

এ হাদীসে মূলতঃ কুরআনের আম (ব্যাপক) হুকুমটি সুন্নাহর মাধ্যমে দুই ভাবে (পরিমাণ ও সংরক্ষণে) খাস (নির্দিষ্ট) হয়ে গেল।

অতএব কুরআন ও সুন্নাহর সম্পর্কের দ্বিতীয় অবস্থা হলো সুন্নাহ কুরআনের মুতলাক (সাধারণ) হুকুমকে মুকাইয়াদ (সীমাবদ্ধ) হিসাবে, মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) হুকুমকে মুফাস্সাল (বিস্তারিত) হিসাবে এবং 'আম (ব্যাপক) হুকুমকে খাস (নির্দিষ্ট) হিসাবে বর্ণনা করে।

সুন্নাহ কুরআনুল কারীমের গোপন রহস্য বর্ণনাকারী। মূলতঃ এটা আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য, এ জন্য তিনি স্বীয় রাসূল ﷺ-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন :

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"আর আপনার প্রতি উপদেশ বাণী (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে আপনি তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিতে পারেন, ফলে তারা চিন্তা গবেষণা করবে।" [সূরাহ আন্-নাহল : ৪৪]

এ আয়াত স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, সুন্নাহ হলো পবিত্র কুরআনের বর্ণনা দানকারী। অতএব সুন্নাহ ব্যতীত কুরআন বুঝা ও মানা অসম্ভব, এ জন্যই অনেক ইসলামী মনীষীগণ ইসলাম জানা ও মানার ক্ষেত্রে কুরআনের আগে সুন্নাহকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যার বাস্তব দৃষ্টান্ত হলো সাহাবায়ে কিরামের উপদেশাবলী, ইমাম আল খাতীব আল বাগদাদী স্বীয় সনদে বর্ণনা করেন : একদা সাহাবী ঈমরান বিন হুসাইন (রাঃ) কিছু ব্যক্তিসহ (শিক্ষার আসরে) বসে ছিলেন। শ্রোতাদের মধ্য হতে একজন বলে ফেললেন, আপনি আমাদেরকে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু শুনাবেন না। তিনি (সাহাবী) বললেন, নিকটে আস, অতঃপর বললেন, তুমি কি মনে কর, যদি

[৩২] আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, হাকিম-সহীহ। দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী, ৪/৮৩৬ পৃঃ।

তোমাদেরকে শুধু কুরআনের উপরই ছেড়ে দেয়া হয়? তুমি কি যোহরের সালাত চার রাকা'আত, আসর চার রাক'আত, মাগরিব তিন রাক'আত, প্রথম দুই রাক'আতে কিরাআত পাঠ করতে হয় ইত্যাদি সব কিছু কুরআনে খুঁজে পাবে? অনুরূপভাবে কাবার তাওয়াফ সাত চক্কর এবং সাফা মারওয়ার তাওয়াফ ইত্যাদি কি কুরআনে খুঁজে পাবে? অতঃপর বললেন : হে মানব সকল! তোমরা আমাদের (সাহাবীদের) নিকট হতে সুন্নাহর আলোকে এ সব বিস্তারিত বিধি-বিধান জেনে নাও। আল্লাহর কসম করে বলছি! তোমরা যদি সুন্নাহ মেনে না চল, তাহলে অবশ্যই ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।"[৩৩]

অতএব সঠিক পথ প্রাপ্ত হতে হলে কুরআনের সাথে কুরআনের রহস্য বর্ণনাকারী ইসলামের পূর্ণ রূপদানকারী সুন্নাহকে অবশ্যই আঁকড়ে ধরতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

তৃতীয় অবস্থা : তৃতীয় অবস্থা হল এমন সব বিষয় যা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন বর্ণনা আসেনি, সে সব বিষয়ে রাসূল ﷺ-এর হাদীস হালাল-হারামের হুকুম বর্ণনা করে দিয়েছে, যেমন- কোন মহিলাকে তার খালাসহ অথবা ফুপিসহ একত্রে দুজনকে বিবাহ করা হাদীসে হারাম করা হয়েছে। বিবাহিত ব্যাভিচারীকে রজম করার বিধান এবং দাদীর জন্য মিরাছী অংশ ইত্যাদি হুকুম গুলি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কোন নির্দেশনা নেই, অথচ হাদীসে তার বৈধতা ও অবৈধতা বর্ণনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের সাথে সুন্নাহর সম্পর্কের যে তিনটি অবস্থা রয়েছে তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় সকল আলেম সমাজ একমত কিন্তু এ তৃতীয় অবস্থা সম্পর্কে কিছু আলেম সমাজ দ্বিমত পোষণ করেছেন। তবে হাদীসে ওই সব বিধান পাওয়াটাকে কেউ অস্বীকার করেন নি। তাই অধিকাংশ আলেম সমাজ তৃতীয় অবস্থা সম্পর্কে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়ূম (রহ.) কুরআনের সাথে সুন্নাহর সম্পর্কের তিনটি অবস্থা বর্ণনা করার পর বলেন : কুরআনের চেয়ে হাদীসে যে সব

---

[৩৩] আল কিফায়াহ- খতীব বাগদাদী, ৪৮ পৃঃ।

বিধান অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে (অর্থাৎ তৃতীয় অবস্থা) এটা মূলতঃ নাবী করীম ﷺ হতেই ওই সব বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাঁর (সুন্নাহর) আনুগত্য অপরিহার্য, কোন ক্রমেই তা অমান্য করা যাবে না। আর ইহা কুরআনের উপর কোন বাড়াবাড়িও নয়, বরং রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য বিষয়ক কুরআনের নির্দেশ পালনেরই অন্তর্ভূক্ত। এ ক্ষেত্রে যদি তাঁর আনুগত্য না করা হয়, তাহলে তাঁর আনুগত্যের কোন অর্থই হয় না এবং তাঁর আনুগত্যের সতন্ত্রতা বর্জিত হয়। আর কুরআনের সাথে মিলে যাওয়া বিষয় ছাড়া কুরআনের অতিরিক্ত বিষয়ে যদি তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা না হয় তাহলে তাঁর আনুগত্যের বিশেষত্ব কোথায়? অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾

"যে রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করল সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য করল।" [সূরা আন্-নিসা, ৮০]

অতএব কোন জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে কিভাবে সম্ভব যে, তিনি কুরআনের চেয়ে অতিরিক্ত বিধান সম্বলিত হাদীস গ্রহণ করবেন না? তিনি কি কোন মহিলাকে স্বীয় খালা বা ফুপীর সাথে একত্রে দু'জনের বিবাহ নিষিদ্ধের হাদীস, রক্ত বা বংশীয়ভাবে যা হারাম হয় দুগ্ধপানের মাধ্যমে তা হারামের হাদীস, খিয়ারে শর্তের হাদীস, শুফায়ার হাদীস, স্বগৃহে বসবাস কালে বন্ধকের হাদীস গ্রহণ করেন না? অথচ এ সবই কুরআনের চেয়ে অতিরিক্ত বিধান সম্বলিত হাদীস (অর্থাৎ এ বিধানগুলি কুরআনে বর্ণিত হয়নি শুধু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে)। অনুরূপভাবে দাদীর মিরাছের হাদীস, বিবাহিত কৃতদাসের স্বাধিনতার হাদীস, মেয়েদের ঋতু অবস্থায় রোযা, সালাত নিষিদ্ধের হাদীস, রোযা অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিবের হাদীস, বিধবা মহিলার ইদ্দত পালন কালে শোক পালনের হাদীস গ্রহণ করেন না? অথচ এসব হাদীসই কুরআনের অতিরিক্ত বিধান সম্বলিত হাদীস"।[৩৪] বস্তুতঃ কুরআনের নির্দেশেই রাসূল ﷺ-এর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা অপরিহার্য চাই তা কুরআনে থাকুক আর নাই থাকুক।

---

[৩৪] ইলামুল মুয়াক্কিঈন, ২/৩১৪-৩১৫ পৃঃ।

কুরআনের নির্দেশ :

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

"রাসূল ﷺ তোমাদের যা দিয়েছেন তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা হতে বারণ করেছেন তা হতে বিরত থাক"। [সূরা আল-হাশর, ৭]

কুরআনের অন্যত্রে এসেছে রাসূল ﷺ-এর সকল সিদ্ধান্ত (বিধি-বিধান) সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়া ছাড়া ঈমানদার হওয়া সম্ভব নয়, তা কুরআনে আছে বা নাই? এ প্রশ্নের কোন সুযোগ নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾

"তোমার রবের কসম তারা কখনও ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ফায়সালাকারী হিসাবে মেনে নেয়। অতঃপর তোমার ফায়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কোন দ্বিধা-সংকোচ থাকবে না এবং সন্তুষ্টচিত্তে তা গ্রহণ করে নিবে।"

[সূরা আন-নিসা, ৬৫]

অতএব কুরআনের নির্দেশেই রাসূল ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন (কুরআন ও সকল প্রকার সহীহ হাদীস) সবই প্রতিটি মু'মিন নর-নারীর গ্রহণীয় ও পালনীয় বিষয়, আল্লাহ আমাদের সে তাওফীক দান করুন। আমীন!

হাদীসের ক্ষেত্রে সালফে সালেহ/সাহাবী ও তাবেঈদের গুরুত্ব প্রদান

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসকে সর্বযুগের ইসলামী মনীষীগণ যথাসাধ্য গুরুত্ব প্রদান করেছেন, তবে এক্ষেত্রে সর্ব প্রথম অবদান রেখেছেন ইসলামী মনীষীদের অনুকরণীয় ও অনুশীলনীয় অগ্রজ সালফে সালেহ্ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ, তাঁরা স্বীয়যুগে সর্বশ্রম দিয়ে শিক্ষা, গবেষণা, সংরক্ষণ, সংকলন, প্রচার-প্রসার এবং বাস্তব প্রয়োগসহ সকল পন্থায় সুন্নাহর পূর্ণগুরুত্ব প্রদান করে এক নযীর স্থাপন করেছেন। নিম্নে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো :

সাহাবীদের যুগে সুন্নাহর গুরুত্ব প্রদান : সাহাবীগণ নাবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় সরাসরি রাসূল ﷺ-এর প্রদত্ত কুরআনের ব্যাখ্যার আলোকে ইসলামের হুকুম আহ্কাম শিক্ষা লাভ করতেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

"আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের প্রতি অবতীর্ণ হওয়া বিষয়গুলি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাদান করেন।" [সূরা আন্-নাহল, ৪৪]

এ জন্যই সাহাবীগণ রাসূল ﷺ-এর প্রতিটি কথা ও কাজ, ইবাদত বন্দেগী এবং আচার-আচরণ অতি গুরুত্ব ও মনোযোগসহকারে লক্ষ করতেন এবং ইসলামের হুকুম আহ্কাম তাঁর কাছ থেকে যত্ন-রপ্ত করে নিতেন। রাসূল ﷺ হতে ইবাদতের নিয়মাবলী শিক্ষা নিতে হবে এজন্য স্বয়ং রাসূল ﷺ নির্দেশ প্রদান করেছেন :

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

"তোমরা সেভাবে সালাত সম্পাদন কর, যে ভাবে আমাকে সম্পাদন করতে দেখেছ"।[৩৫]

---

[৩৫] সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৬৩১।

তিনি আরো বলেন : خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ

"তোমরা আমার হজ্ব সম্পাদনের পদ্ধতি হতে তোমাদের হজ্ব সম্পাদনের পদ্ধতি জেনে নাও"।[৩৬]

সাহাবীগণ এভাবেই রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতকে সরাসরি রাসূল ﷺ হতেই গ্রহণ করতেন। এমনকি রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ ছাড়াই তাঁরা রাসূল ﷺ-এর কার্যসমূহের অনুসরণ করতেন। যেমন- রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বর্ণের আংটি বানালেন সাহাবীগণ দেখাদেখি স্বর্ণের আংটি বানালেন, অতঃপর যখণ স্বর্ণ পুরুষদের জন্য হারাম হয়ে গেল তখন রাসূল ﷺ স্বর্ণের আংটি খুলে ফেললেন, দেখাদেখি সকল সাহাবীগণও আংটি খুলে ফেললেন"।[৩৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় এভাবেই সাহাবীগণ তাঁর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার প্রাণ-পণ চেষ্টা করতেন। রাসূল ﷺ ওফাত গ্রহণের পর সাহাবীগণ তাঁর সুন্নাতকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার জন্য বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। একে অপরের কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহে প্রতিযোগীতায় অবতরণ করতেন। এমনকি সুদূর পথ অতিক্রম করেও হাদীস শিক্ষা হতে বিরত হননি। একটি হাদীসের জন্য এক মাসের পথ অতিক্রম করে হলেও তা সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। যেমন- সাহাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) একটি হাদীস শিক্ষার জন্য মদীনা হতে শাম এক মাসের পথ অতিক্রম করে সেখানে গেছেন।

আবার রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ, কথা ও কাজ বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। পূর্ণ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অপরের কাছে কখনও বর্ণনা করতেন না। কারণ, রাসূল ﷺ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যেমন উৎসাহ প্রদান করেছেন, তেমনি হাদীস বর্ণনায় মিথ্যার আশ্রয় এর ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর কোন মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান নির্ধারণ করে নিল"।[৩৮]

---

[৩৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩১০।
[৩৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৬৬।
[৩৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ১০৭।

তিনি আরো বলেন :

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

"একজন ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যাকিছু শুনে (সত্য-মিথ্যা যাচাই ছাড়া) তাহাই অন্যের কাছে বর্ণনা করে"।[৩৯]

অতএব সাহাবীগণ যেমনি রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ সংগ্রহ ও প্রচার-প্রসারে আগ্রহী ও উৎসাহী তেমনী আবার ভুল-ত্রুটি ঘটতে পারে এ আশংকায় চরম সতর্কবান। কোন কিছু শুনে বা দেখে নিশ্চিত না হয়ে কিছু বর্ণনা করতেন না। যেমন রাসূল ﷺ-এর একনিষ্ঠ খাদেম সাহাবী আনাস (রাঃ) বলেন :

لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ أُخْطِئَ لَحَدَّثْتُكُمْ بِأَشْيَاءَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ قَالَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَذَاكَ أَنِّي سَمِعْتُهُ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"আমার যদি ভুল ত্রুটির আশংকা না হত তাহলে আমি রাসূল ﷺ হতে অনেক কিছু বর্ণনা করতাম যা তাকে বলতে শুনেছি, কিন্তু ভয় হয় যে, তিনি ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার উপর মিথ্যারোপ করল সে যেন তার স্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নিল"।[৪০]

এমনিভাবে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার সহ অনেক সাহাবী ভুল-ত্রুটির আশংকায় অনেক হাদীস বর্ণনা করেন নি।

অতএব এতে প্রতিয়মান হয় যে, নাবী ﷺ-এর সাহাবীগণ হাদীস সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারে অপরিসীম গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

---

[৩৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৫।
[৪০] সুনান দারেমী, ১/৬৭ পৃঃ।

তাবেঈদের যুগে সুন্নাহর গুরুত্ব প্রদান

রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণের বিদায়ের পরই শুরু হল তাবেঈনদের যুগ। তাবেঈদের যুগের শুরুতেই প্রকাশ পেল ইসলামের নামে নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত। এ ষড়যন্ত্র মূলতঃ সাহাবীদের পরেই নয় বরং তা শুরু হয়েছে আরো আগেই। ইসলামের শত্রুরা যখন প্রকাশ্য মুকাবিলায় ব্যর্থতার শিকার হলো, তখন শুরু হল সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত। ইহা মূলতঃ দ্বিতীয় খলীফা আমীরুল মু'মিনি ওমার (রাঃ)-কে মাজুসী/অগ্নীপুঁজক এর মাধ্যমে হত্যার মধ্য দিয়েই শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ খলীফার ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। একে একে রাসূল ﷺ-এর একনিষ্ঠ সহচর বা সাহাবীদের বিদায়ের পাশাপাশি ইসলাম আগ্রাসী অপশক্তির ছোবলের তেজ আরো প্রখর হতে লাগল। খাওয়ারেজ, রাফেযী, মুরজিয়া ও কাদেরীয়া ইত্যাদি ফেৎনার মুখোস উন্মোচন হল। ইসলামী বিষয়াদীতে সংশয়-সন্দেহ অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগল। এমতাবস্থায় সুন্নাহ সংরক্ষণ একটি জরুরী ও জটিল বিষয় হয়ে দাঁড়াল। এ সন্ধিক্ষণে তাবেঈগণ নানাভাবে সুন্নাহ সংরক্ষণ ও সংগ্রহ করে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। সুন্নাহ সংরক্ষণে তাঁদের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ[৪১] :

১. العناية بحفظها হাদীস মুখস্ত করণে গুরুত্ব প্রদান।

২. السوال عـن الاسـناد হাদীসের সনদ/ সূত্রের সঠিকতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ, অর্থাৎ সনদ যাচাই করণ।

৩ البحـث في أحـوال الرجـال ونقلـة الأخبـار হাদীস বর্ণনাকারী/রাবীদের জীবন-চরিত সম্পর্কে গবেষণা ও বিশ্লেষণ।

৪. تدوين السنة الذي بدأ بصحف وأجزاء ثم تطـور বিভিন্ন পুস্তিকা ও খণ্ড খণ্ড গ্রন্থে হাদীস সংকলন, যাহা পরবর্তীতে বুখারী, মুসলিম ও মুয়াত্ত্বা ইত্যাদি সংকলনে রূপলাভ করে।

---

[৪১] তাদবীনুস সুন্নাহ, ৩৮ পৃঃ।

সাহাবীদের শেষ লগ্নে তাবেঈদের যুগে বিদ'আত, খোরাফাত ইত্যাদির বিকাশ ঘটলে সরলভাবে হাদীস গ্রহণ করা হত না, বরং পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই করে ছিকাহ্ অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবী/বর্ণনাকারীর হাদীসই শুধু গ্রহণ করা হত। কারণ এ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য স্বয়ং রাসূল ﷺ নিজেই ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ

"সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : শেষ যুগে কতক মিথ্যুক দাজ্জালের আগমন ঘটবে, তারা তোমাদের কাছে এমন সব হাদীস পেশ করবে, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও কখন শুনেনি, অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যাও, তারা যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্টতা ও ফিৎনা-ফ্যাসাদে নিপতিন করতে না পারে।[৪২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সতর্কবাণীর আলোকে সাহাবীদের শেষ যুগে এবং তাবেঈদের যুগে হাদীস গ্রহণে রাসূল ﷺ-এর নাম শুনলেই যথেষ্ট মনে করা হত না, বরং খুবই সতর্কতার সাথে যাচাই-বাছাই করে হাদীস গ্রহণ করা হত। ইমাম মুসলিম (রহ.) সাহাবী ও তাবেঈদের হাদীস গ্রহণের অবস্থাসমূহ স্বীয় গ্রন্থ সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হল :

(১) ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বীয় সনদে প্রসিদ্ধ তাবেঈ মুজাহিদ (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : বাশীর বিন কা'ব আল আদাবী সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে আসলেন এবং হাদীস বর্ণনা শুরু করলেন, বলতে লাগলেন : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইত্যাদি" কিন্তু সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাকে হাদীস বর্ণনার কোন সুযোগ দিলেন না। এমনকি তার দিকে দৃষ্টিপাতও করলেন না। বাশীর

---

[৪২] মুকাদ্দামাহ সহীহ মুসলিম, ১/৩৬ পৃঃ, হাদীস নং- ১৬।

বিন কা'ব বললেন, হে ইবনু আব্বাস! কি ব্যাপার, আপনি আমার হাদীস শুনছেন না কেন? আমি আপনাকে রাসূল ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করছি, আর আপনি কোন কর্ণপাত করছেন না? তার জবাবে ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, প্রথম পর্যায়ে কোন ব্যক্তিকে যখনই বলতে শুনতাম যে, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- সাথে সাথে তার কথায় আমরা মনোযোগী হতাম এবং খুব গুরুত্ব দিয়ে তার কথা শুনতাম, কিন্তু যখন মানুষ বিভিন্ন ছলচাতুরী শুরু করল তখন হতে আমাদের জানা বিষয় ছাড়া সাধারণ মানুষ হতে অন্য কিছু শুনি না এবং গ্রহণ করি না"।[৪৩]

এ বর্ণনাটি প্রমাণ করে যে, রাসূল ﷺ-এর হাদীস গ্রহণে তাঁরা কত সতর্ক ছিলেন। সাহাবী ছাড়া অন্য কেউ রাসূল ﷺ-এর নামে বর্ণনা করলেও নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সে হাদীস গ্রহণ করতেন না।

(২) প্রসিদ্ধ তাবেঈ মুহাম্মদ বিন সীরিন (রহ.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন :

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ "নিশ্চয় হাদীসের জ্ঞান হল দ্বীনের অন্যতম অংশ, অতএব ভালভাবে লক্ষ কর তোমরা কাদের হতে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ"।[৪৪]

(৩) তিনি আরো বলেন : "হাদীসের সনদ/সূত্র ও রাবী বা বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হত না, কিন্তু যখন হতে (কাদেরীয়া, মুরজিয়া, জাবারিয়া ও রাফেযী ইত্যাদি বিদ'আতের) ফিৎনা প্রকাশ পেল তখন হতে জিজ্ঞাসা শুরু হল : سموا لنا رجالكم... "যাদের বরাতে হাদীস বর্ণনা করছ তাদের নাম উল্লেখ কর", ব্যক্তিরা যদি সুন্নাতপন্থী হতেন তাহলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হত, আর যদি বিদ'আতী হতেন তাহলে তাদের হাদীস প্রত্যাক্ষাণ করা হত"।[৪৫]

(৪) আব্দান বিন উছমান মারওয়াযী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (رحمه الله)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : اَلْإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ لَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ "হাদীসের

---

[৪৩] মুকাদ্দামাহ সহীহ মুসলিম, ১/৩৯ পৃঃ, আছার নং- ২১।
[৪৪] মুকাদ্দামাহ সহীহ মুসলিম, ১/৪৪ পৃঃ, আছার নং- ২৬।
[৪৫] মুকাদ্দামাহ সহীহ মুসলিম, ১/৪৪ পৃঃ, আছার নং- ২৭।

সনদ/সূত্র দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ যদি এ সনদ বর্ণনার ব্যাবস্থা না থাকত তাহলে যার যা ইচ্ছা হত তাই বলত"।[৪৬]

তাবেঈদের হাদীস সংগ্রহে এবং সংরক্ষণে এ নীতি অবলম্বন বিদ'আতী চক্রের ষড়যন্ত্র এবং ইসলামের শত্রুদের সুদূর পরিকল্পিত চক্রান্ত নস্যাত হয়ে যায়। হাদীসের নাম দিয়ে বা রাসূল ﷺ-এর বরাতে মিথ্যাচারের পথে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে সনদ বিহীন বর্ণনার সুযোগ ও মিথ্যুক দাজ্জালদের দাজ্জালি ও মিথ্যাচার বন্দ হয়ে যায়, বা চালু থাকলেও পরিশেষে মিথ্যা প্রকাশ পেয়ে যায়।

তাবেঈদের এ নীতি অবলম্বন করে সর্বপ্রথম হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালা প্রণয়ন করেন ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাঁর "আর রিসালাহ" ও "কিতাবুল উম্ম" গ্রন্থদ্বয়ে।[৪৭] এরপর এ শাস্ত্রের গভীর সমুদ্রে পাড়িজমান ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.) সহ আরো অনেকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে জাযায়ে খাইর দান করুন। আমীন!

---

[৪৬] মুকাদ্দামাহ সহীহ মুসলিম, ১/৪৭ পৃঃ, আছার নং- ৩২।
[৪৭] তাইসীর মুসত্বলাহিল হাদীস, ১০ পৃঃ।

الباب الثاني

نبذة من حياة الأئمة الأربعة وموقفهم من اتباع السنة

দ্বিতীয় অধ্যায়

চার ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সুন্নাহ্ অনুসরণে ইমামদের অবস্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ

চার ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মহামতি ইমামদের জীবনী এখানে আলোচনা করা মূল উদ্দেশ্য নয়, শুধুমাত্র পাঠকদের কাছে তাঁদের জীবনী সম্পর্কে সামান্য কিছু ধারণা দেয়াই হলো উদ্দেশ্য, কারণ তাঁদের বিশাল আলোময় জীবন এ কয়েক লাইনে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। অতএব অতি সামান্নভাবে তাঁদের জীবনী সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য তুলে ধরা হল।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম, উপনাম ও বংশ : নাম নু'মান, উপনাম আবু হানীফা। বংশনামা : "নু'মান বিন ছাবিত বিন যুত্বাই আল খায্যায আল কুফী।[৪৮] তিনি কাপরের ব্যবসায়ী ছিলেন, তাই আল খায্যায বলে পরিচিত এবং তিনি কুফা নগরীতে জন্মলাভ করেছেন ও সেখানে জীবন-যাপন করেছেন এজন্য আল-কুফী বলে পরিচিত। বংশগতভাবে তিনি আত্-তাইমী, অর্থাৎ তাঁর দাদা "যূত্বাই" রাবীয়া বংশের উপগোত্র বনী তাইমিল্লাহ বিন ছা'লাবার অধিনস্ত ছিলেন, এ সূত্রেই তিনি বংশগতভাবে আত্-তাইমী বলে পরিচিত।[৪৯]

জন্ম ও প্রতিপালন : বিশুদ্ধ মতে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কুফা নগরীতে ৮০ হিঃ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কুফা নগরীতে প্রতিপালিত

---

[৪৮] তারীখে কাবীর লিল বুখারী- ৮/৮১ পৃঃ, তারিখে বাগদাদ- ১৩/৩২৩ পৃঃ, তাযকেরাতুল হুফ্ফায- ১/১৬৮ পৃঃ, সিয়ারু আলামিন্নুবালা ৬/৩৯০ পৃঃ, আল কামিল ফিত্তারীখ- ৫/৫৮৫ পৃঃ মিযানুল ই'তিদাল- ৪/২৬৫ পৃঃ, তাহ্যীবুত্তাহযীব- ১০/ ৪৪৯ পৃঃ ইত্যাদি।

[৪৯] আল-আন্সাব লিস্সাম আনী- ৫/১০৩ পৃঃ, আল মাজরুহীন- ৩/৬৩ পৃঃ।

হন এবং জীবনের শুরুতেই তিনি গার্মেন্টস ব্যবসায় পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং সততার সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করায় তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।[৫০]

শিক্ষা জীবন : ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) জীবনের প্রাথমিক পর্যায় ব্যবসায়ী কর্মে আত্মনিয়োগ করেন, শিক্ষা-দিক্ষায় মনোনিবেশ হননি। ইমাম শা'আবী (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাত ঘটলে তাঁর পরামর্শে তিনি শিক্ষামুখী হন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) নিজেই বলেন : "আমি একদিন ইমাম শা'আবীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি কার কাছে যাচ্ছ? আমি তাকে উস্তায সম্বোধন করে বললাম যে, আমি বাজারে যাচ্ছি। ইমাম শা'আবী (রহ.) বললেন : "তোমার বাজারে যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিনি, আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোন আলিমের কাছে যাচ্ছ?" জবাবে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বললেন, "আসলে আলিমদের সাথে আমার যোগাযোগ খুবই কম।" ইমাম শা'আবী (রহ.) বললেন : "না তুমি এরূপ করো না, বরং তুমি শিক্ষামুখী হও এবং আলিমদের সাথে উঠাবসা শুরু কর, কারণ আমি তোমার মাঝে ভাল আলামত দেখছি।" ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন : ইমাম শা'আবীর এ উপদেশ আমার হৃদয়ে রেখাপাত করল, ফলে আমি বাজারে যাওয়া বন্ধ করলাম এবং জ্ঞান গবেষণামুখী হলাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপদেশের মাধ্যমে আমাকে উপকৃত করেছেন।[৫১]

এভাবেই আবূ হানীফা (রহ.) শিক্ষা জীবন শুরু করেন। শিক্ষা জীবন শুরু করে তিনি কালাম শাস্ত্র ও তর্কবিদ্যা শিক্ষালাভ করে ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদে তর্ক সংগ্রাম চালিয়ে তার্কিক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু এ তর্ক চর্চা কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে বিঘ্নতা সৃষ্টি করলে তর্ক চর্চা বর্জন করে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহ্ চর্চায় মনোনিবেশ করেন।[৫২]

ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) শিক্ষকবৃন্দ : ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ছোট বয়সে দু'একজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেন, যেমন-

---

[৫০] তারিখে বাগদাদ ১৩/৩২৫ পৃঃ।

[৫১] মানাকিব আবী হানীফাহ্ লিল মাক্কী- ৫৪ পৃঃ।

[৫২] উক্বূদুল জিমান, ১৬১ পৃঃ।

আনাস বিন মালিক (রাঃ), কিন্তু তাদের কাছ থেকে তেমন কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি, কারণ তিনি প্রাথমিক যুগে ব্যবসায়ী কর্মে নিয়োজিত ছিলেন, অতঃপর ইমাম শা'আবীর অনুপ্রেরণায় দ্বীন শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন।[৫৩] ইমাম আল মিয্‌যী (রহ.) ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) যাদের কাছে শিক্ষালাভ করেছেন তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে মোট পঞ্চাশ জন শাইখ এর নাম উল্লেখ করেন। নিম্নে তাদের প্রসিদ্ধ কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হল :

১. হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান আল আশ্‌য়ারী (রহ.)।
২. যায়িদ বিন আলী আল হাশেমী (রহ.)।
৩. ইমাম আতা বিন আবী রাবাহ আল কারশী (রহ.)।
৪. আবদুল মালিক বিন আবিল মাখারিক আল মাসরী (রহ.)।
৫. আদী বিন ছাবিত আল আনসারী (রহ.)।
৬. ইমাম কাতাদাহ বিন দা'য়ামাহ আস সাদুসী (রহ.)।
৭. মুহাম্মদ বিন আলী আল হাশেমী (রহ.) ইত্যাদি।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর ছাত্রবৃন্দ : ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) হতে অনেক গুণীজন দ্বীনী জ্ঞান শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম মিয্‌যী (রহঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর ছাত্রদের বর্ণনা দিতে গিয়ে সত্তর জনের নাম উল্লেখ করেন।[৫৪] নিম্নে তাদের প্রসিদ্ধ কয়েক জন :

১. জারীর বিন আবদুল হামীদ আল কুফী (রহ.)।
২. হাম্মাদ বিন আবী হানীফাহ আল কুফী (রহ.)।
৩. আল হাকাম বিন আব্দুল্লাহ আল বালখী (রহ.)।
৪. ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক আল হানযালী (রহ.)।
৫. ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান আশ্‌শায়বানী (রহ.)।
৬. ইমাম নূহ বিন আবী মারয়াম আল মারওয়াযী (রহ.)।

৭. ইমাম ইয়াকুব বিন ইবরাহীম আবূ ইউসূফ আল কাযী (রহ.) ইত্যাদি।

---

[৫৩] উকূদুল জিমান, ১৬০ পৃঃ।
[৫৪] তাহযীবুল কামাল, ৩/১৪১৫ পৃঃ।

জ্ঞান গবেষণায় ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) : ইমাম কাবীসাহ্ বিন উকবাহ (রহ.) বলেন : "ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) প্রথম পর্যায়ে তর্কবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে বিদ'আতী বাতিল পন্থীদের সাথে তর্কে লিপ্ত হন, এভাবে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী তার্কিকে পরিণত হন। অতঃপর তিনি তর্কচর্চা বর্জন করে ফিকাহ্ ও সুন্নাহ চর্চায় লিপ্ত হন এবং একজন ইমামে পরিণত হন।"[৫৫]

ফিকাহ্ শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) : ফিকাহ্ শাস্ত্রে আবূ হানীফা (রহ.)-এর অবস্থান ও অবদান সম্পর্কে বলার অপেক্ষা রাখেনা, কারণ তিনি ফিকাহ্ শাস্ত্রের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইমাম সাহেবের অন্যতম ছাত্র ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহ.) বলেন, "ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) স্বীয় যুগে ফিকাহ্ শাস্ত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি ছিলেন"।[৫৬] তিনি সমযুগে প্রসিদ্ধ তাবেঈ যেমন- আত্বা বিন রাবাহ, নাফি, মাওলা ইবনু ওমার ও কাতাদাহ প্রভৃতি তাবেঈদের (রাহিমাহুমুল্লাহ) হতে ফিকাহ্ শাস্ত্রে পণ্ডিত্ব অর্জন করেন।[৫৭] তাঁর হতেও অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু ফিকাহ্ শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। তাবে ফিকাহ্ শাস্ত্রে ইমাম সাহেবের উল্লেখযোগ্য কোন রচিত গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ফিকাহ্ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্ব অর্জন করেন এবং বহু জ্ঞান পিপাসুকে ফিকাহ্ শিক্ষাদান করেন, কিন্তু প্রচলিত সমাজে যেমন- ইমাম সাহেবের বরাত দিয়ে প্রকাশ্য হাদীসকে বর্জন করে ফিকাহ্কে প্রাধান্য দেয়া হয়। ইহা কখনও ইমাম সাহেবের স্বভাব নয় এবং মাযহাবও নয়। "সুন্নাতে রাসূল ﷺ অনুসরণে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অবস্থান" পরিচ্ছেদে আমরা এ বিষয়টি প্রমাণসহ আলোকপাত করব ইন্‌শাআল্লাহ।

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) : ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) একশত হিজরীর পরে অর্থাৎ তাঁর বিশ বছর বয়সের পর তিনি হাদীস শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ আলিম হতে হাদীস

---

[৫৫] উকূদুল জিমান, ১৬১ পৃঃ।

[৫৬] সিয়ারু আ'লামিন্নুবালা, ৬/৪০৩ পৃঃ।

[৫৭] উসূলুদ্দীন ইন্দা ইমাম আবূ হানীফা, ৯৫ পৃঃ।

শিক্ষালাভ করেন।[৫৮] কিন্তু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা খুবই নগন্য। এর দুটি কারণ হতে পারে,

প্রথম কারণ : তিনি হাদীস বর্ণনায় কঠোরতা অবলম্বন করতেন, অর্থাৎ হাদীস বর্ণনাকারীর পূর্ণ মুখস্ত বর্ণনাকেই শুধু মেনে নিতেন। ইমাম ইবনু সালাহ (রহ.) বলেন :

شدّد قوم في الرواية فأفرطوا، وتساهل فيها آخرون ففرطوا ومن التشدد مذهب من قال : لاحجة إلا فيما رواه الراوى من حفظه، وذلك مروى عن مالك و أبي حنيفة

"হাদীস বর্ণনায় একশ্রেণীর মানুষ কঠোরতা অবলম্বন করে সীমালঙ্ঘন করেছেন, আবার আরেক শ্রেণী শিথিলতা অবলম্বন করে সীমালঙ্ঘন করেছেন। কঠোরতার মধ্যে হল, যারা মনে করেন যে, বর্ণনাকারীর শুধু মুখস্ত বর্ণিত হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না, ইহা ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ হানীফার মত।"[৫৯]

দ্বিতীয় কারণ : ইমামের হাদীস বর্ণনা কম হওয়ার অপর কারণ হলো তিনি মাসআলা-মাসায়েলের গবেষণায় বেশী ব্যস্ত থাকতেন। হাদীস বর্ণনার সুযোগ হত না।

উকূদুল জিমান গ্রন্থের লিখক বলেন,

وإنما قلت الرواية عنه..... لاشتغاله عن الرواية باستنباط المسائل من الأدلة كما كان أجلاء الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما يشتغلون بالعمل عن الرواية حتى قلت رواياتهم بالنسبة إلى كثرة إطلاعهم-

"ইমাম সাহেবের বিভিন্ন দলীলের মাসআলার গবেষণায় ব্যস্ততার দরুন হাদীস বর্ণনা কমে গেছে, যেমন- প্রসিদ্ধ সাহাবী আবূ বকর, ওমার (রাঃ) সহ অনেকেই প্রচুর জানা-শুনা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কাজে ব্যস্ততার দরুন হাদীস বর্ণনা করতে পারেন নি।"[৬০]

---

[৫৮] সিয়ারু আলামিন্নুবালা, ৬/৩৯৬ পৃঃ।
[৫৯] উলূমুল হাদীস- ১৮৫, ১৮৬ পৃঃ, (আত্তাকঈদ ওয়াল ঈযাহ সহ)।
[৬০] উকূদুল জিমান- ৩১৯, ৩২০ পৃঃ।

অবশ্য এ ব্যস্ততার কারনে তিনি হাদীস সংরক্ষণেও তেমন গুরুত্ব দিতে পারেননি। ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন,

لم يصرف الإمام همته لضبط الألفاظ والأسانيد، وإنما كانت همته القرآن والفقه، وكذلك حال كل من أقبل على فن، فإنه يقصر عن غيره

"ইমাম সাহেব হাদীসের শব্দ ও সনদ বা সূত্র রপ্ত ও যবত করণে গুরুত্ব দিতে পারেননি, তাঁর গুরুত্ব ছিল কুরআন ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে, বস্তুতঃ সকল ব্যক্তির এমনই অবস্থা হয়, এক বিষয়ে গুরুত্ব দিলে অপর বিষয় ঘাটতি হয়ে যায়।"[৬১]

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর নামে কিছু হাদীসের সংকলন উল্লেখ করা হয় এবং বলা হয় এগুলি ইমাম আবূ হানীফার (রহ.)। মূলতঃ ওই সব ইমাম সাহেবের সংকলন নয় বরং তাঁর অনেক পরে সেগুলি সংকলন করে তাঁর নামে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।[৬২] আল্লামাহ শাহ্ আবদুল আযীয দেহলবী হানাফী (রহ.) বলেন :

بل جمعها الجامعون بعد أزمنة متطاولة

"বরং সে গ্রন্থগুলো অনেক পরে বিভিন্নজন সংকলন করেছেন।"[৬৩]

ইমাম ইবনু হাজার আসকালামী (রহ.) বলেন :

وكذلك مسند أبي حنيفة توهم أنه جمع أبي حنيفة وليس كذلك...

"অনুরূপ মুস্নাদ আবী হানীফাহ ধারণা করা হয় ইহা ইমাম আবূ হানীফার সংকলন, আসলে তা নয়......।"[৬৪]

অতএব বলা যেতে পারে যে, ইমাম আবূ হানীফার নামে হাদীসের যে গ্রন্থগুলি উল্লেখ করা হয় সেগুলি হয়তবা ইমাম আবূ হানীফা হতে তাঁর ছাত্ররা শিক্ষালাভের পর যে হাদীসগুলি সংকলন করে তাঁর নামে প্রকাশ করেছেন, অথবা অতি ভক্তির কারণে নিজের সংগৃহীত হাদীস তাঁর নামে সংকলন করে প্রকাশ করা হয়েছে, ওয়াল্লাহ 'আলাম।

---

[৬১] মানাকিব আবী হানীফাহ ও সাহিবাইহী লিয্যাহাবী- ২৮ পৃঃ।

[৬২] উসূলুদ্দীন ইন্দা আবী হানীফা- ১০০-১০৭ পৃঃ।

[৬৩] বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ৫০ পৃঃ।

[৬৪] তা'জীলুল মানফাআহ, ০৫ পৃঃ।

সঠিক আক্বীদা বিশ্বাসে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) : ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বাতীল আক্বীদা পোষণকারী জাহমিয়া, মুরযিয়া, মুতাযিলা ইত্যাদি সম্প্রদায়গুলির সাথে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, হক প্রতিষ্ঠায় বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাসে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। প্রায় সকল মাসআলায় তিনি একমত শুধু ঈমানের সংজ্ঞা, হ্রাসবৃদ্ধি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার স্ব-সত্ত্বায় সর্বত্র বিরাজমান না হওয়া বরং আরশে সমুন্নত হওয়া এবং নিরাকার না হওয়া বরং তাঁর সুস্পষ্ট গুণাবলী সাব্যস্ত করাই হলো ইমামের আক্বীদা বিশ্বাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আজ যারা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবের দুহাই দেয়, তারাই আবার ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর বিপরীত আক্বীদাহ-বিশ্বাস পোষণ করে। প্রকৃতপক্ষে তারা ইমাম আবূ হানীফার ফতোয়া অনুযায়ী মুসলমান থাকতে পারে না। কারণ- ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, "যে বিশ্বাস করে না যে আল্লাহ স্ব-সত্ত্বায় আরশের উপরে আছেন (অর্থাৎ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ স্ব-সত্ত্বায় সর্বত্র বিরাজমান) সে কাফির।"[৬৫]

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর আক্বীদাহ্ বিষয়ক পাঁচটি গ্রন্থ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রকৃত পক্ষে এগুলো ইমাম সাহেবের প্রতি শুধু সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তিনি এগুলো লিখেন নি। তবে "ফিক্বহুল আকবার" নামে যে গ্রন্থটি ইমামের ছেলে হাম্মাদ (রহ.)-এর সনদে, সেটি অধিকাংশের মতে ইমাম সাহেবের সংকলন,[৬৬] ওয়াল্লাহু 'আলাম। মূল কথা ইমাম সাহেবের নিজের রচিত হোক বা তাঁর থেকে শুনে হাম্মাদের রচনা হোক সর্বাবস্থায় প্রমাণ করে যে, ইমাম সাহেবের এবং তাঁর ছেলে হাম্মাদ সঠিক আক্বীদাহ্ বিশ্বাসের উপর ছিলেন, যা হতে বর্তমানের হানাফী সমাজ পদস্খলিত হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সঠিক আকীদার উপর থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

---

[৬৫] মুখ্‌তাসারু আলউ'লু ১৩৬ পৃঃ।

[৬৬] উসূলুদ্দীন ইনদা আবী হানীফাহ, ১১৫-১২৫ পৃঃ, আশ্‌শারহ আল মুয়াসসার, ০৩ পৃঃ, শরহ কিতাব ফিক্বহুল আকবার, ০৫ পৃঃ, শরহুল আক্বীদাহ তাহাবীয়াহ, ১/২৬৬ পৃঃ।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সম্পর্কে আলিম সমাজের প্রশংসা : ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় অনেকেই প্রশংসা করেছেন, যেমন-

১. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন : "ইমাম সাহেব শিক্ষা, আল্লাহ ভীরুতা ও আখিরাতমুখী হিসাবে এক বিশেষ অবস্থানে ছিলেন। আবূ জাফর আল মানসুরের কাজী বা বিচারকের পদ গ্রহণের জন্য তাঁকে প্রহার পর্যন্ত করা হয়েছে তবুও তিনি তা গ্রহণ করেননি, আল্লাহ তাকে বিশেষ রহম করুন।"[৬৭]

২. ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন : "যদিও মানুষেরা ইমাম আবূ হানীফার কিছু বিষয়ে বিরোধিতা করেছেন এবং অপছন্দ করেছেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধিতে কারো কোনরূপ সন্দেহ নেই।"[৬৮]

৩. ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন : "ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) একজন বিশিষ্ট আলিম, গবেষক, সাধক ও ইমাম ছিলেন। তিনি বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, রাজা-বাদশাহ্দের কোন পুরস্কার গ্রহণ করতেন না।"[৬৯]

ইমামের মৃত্যুবরণ : মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ইমাম আবূ হানাফী (রহ.) ১৫ই শাবানে ১৫০ হিঃ, ৭০ বছর বয়সে পরপারে পাড়িজমান, এবং বাগদাদের গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।[৭০] আল্লাহ তাঁকে রহম করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন। আমীন!

---

[৬৭] উকূদুল জিমান, ১৯৩ পৃঃ।
[৬৮] মিনহাজুস সুন্নাহ, ২/৬১৯ পৃঃ।
[৬৯] তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/১৬৮ পৃঃ।
[৭০] আল ইন্তিকা, ১৭১ পৃঃ।

ইমাম মালিক (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জিবনী

নাম, উপনাম ও বংশ : নাম মালিক, উপনাম আবূ আব্দুল্লাহ। বংশনামা : মালিক বিন আনাস বিন আবূ আমির বিন আমর বিন হারিস আল-আসবাহী। তিনি আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র কাহ্‌ত্বান এর উপগোত্র আসবাহ্ অন্তর্ভূক্ত, এজন্য 'আল-আসবাহী' বলে পরিচিত।[৭১]

জন্ম ও প্রতিপালন : ইমাম মালিক (রহ.) পবিত্র মদীনা নগরীতে এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষানুরাগী মুসলিম পরিবারে জন্মলাভ করেন। জন্মের সন নিয়ে কিছু মতামত থাকায় ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন : বিশুদ্ধ মতে ইমাম মালিক (রহ.)-এর জন্ম সন হল ৯৩ হিজরী, যে সনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খাদেম আনাস বিন মালিক (রা.) মৃত্যুবরণ করেন।[৭২]

তিনি পিতা আনাস বিন মালিকের কাছে মদীনায় প্রতিপালিত হন। তাঁর পিতা তাবে-তাবেঈ ও হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন, যার কাছ থেকে ইমাম যুহ্‌রীসহ অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেন। খুদ ইমাম মালিকও পিতার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৭৩] তাঁর দাদা আবূ আনাস মালিক (রহ.) প্রসিদ্ধ তাবেঈ ছিলেন, যিনি ওমার, আয়িশা ও আবু হুরায়রা (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেন।[৭৪] তাঁর পিতামহ আমির বিন আমর (রা.) প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন।[৭৫] এ সম্ভ্রান্ত দ্বীনী পরিবেশে জ্ঞানপিপাসা নিয়েই তিনি প্রতিপালিত হন।

শিক্ষা জীবন : রাসূল (ﷺ)-এর হিজরতের পর হতে আজও পর্যন্ত দ্বীনী জ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্র হলো মদীনা। সে মদীনাতে জন্মলাভ করার অর্থ হল দ্বীনী জ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রেই জন্ম লাভ করা। বিশেষ করে বংশীয়ভাবে তাঁদের পরিবার ছিল দ্বীনী জ্ঞানচর্চায় অগ্রগামী। এজন্য তিনি শৈশবকাল

---

[৭১] তারতীবুল মাদারিক, ১/১০২ পৃঃ, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/৪৮ পৃঃ, আল-আনসাব লিস্‌সাম আনী, ১/২৮৭ পৃঃ, আত্-তামহীদ, ১/৮৯ পৃঃ, মানাকিব মালিক লিয্‌যাওয়াবী, ১৬০-১৬২ পৃঃ, আল-ইনতিকা, ৯-১১ পৃঃ ইত্যাদি।

[৭২] তারতীবুল মাদারিক, ১/১১০ পৃঃ, মানাকিব মালিক লিয্‌যাওয়াবী, ১৫৯ পৃঃ।

[৭৩] মানহাজু ইমাম মালিক, ২২ পৃঃ।

[৭৪] তারতীবুল মাদারিক, ১/১০৭ পৃঃ।

[৭৫] আল ইসাবাহ ৭/২৯৮ পৃঃ।

হতেই শিক্ষা শুরু করেন। বিশেষ করে তাঁর মাতা তাকে শিক্ষার প্রেরণা যোগান। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন : আমি একদিন মাকে বললাম, "আমি পড়ালিখা করতে যাব! মা বললেন : আস শিক্ষার লেবাস পড়, অতঃপর আমাকে ভাল পোষাক পড়ালেন, মাথায় টুঁপি দিলেন এবং তার উপর পাগড়ী পড়িয়ে দিলেন, এরপর বললেন : এখন পড়া লিখার জন্য যাও।

তিনি বলেন : মা আমাকে ভালভাবে কাপড় পড়িয়ে দিয়ে বলতেন : যাও মদীনার প্রসিদ্ধ আলিম রাবিয়াহর কাছে এবং তাঁর জ্ঞান শিক্ষার আগে তাঁর আদব আখলাক শিক্ষা কর।[৭৬] এভাবে তিনি মদীনার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, ফকীহদের নিকট হতে শিক্ষালাভ করেন।

ইমাম মালিকের (রহ.) শিক্ষক বৃন্দ : ইমাম মালিক (রহ.) অসংখ্য বিদ্যানের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ইমাম যুরকানী (রহ.) বলেন : "ইমাম মালিক (রহ.) নয়শতর অধিক শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। বিশেষ করে ইমাম মালিক স্বীয় গ্রন্থ মুয়াত্ত্বায় যে সব শিক্ষক হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদেরই সংখ্যা হল ১৩৫ জন, যাদের নাম ইমাম যাহাবী "সিয়ার" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৭৭] তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন নিম্নরূপ :

১. ইমাম রাবীয়া বিন আবূ আবদুর রহমান (রহ.)।
২. ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুসলিম আয্‌যুহ্‌রী (রহ.)।
৩. ইমাম নাফি মাওলা ইবনু ওমার (রহ.)।
৪. ইব্‌রাহীম বিন উক্‌বাহ (রহ.)।
৫. ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ বিন সা'দ (রহ.)।
৬. হুমাইদ বিন কায়স আল 'আরজ (রহ.)।
৭. আইয়ূব বিন আবী তামীমাহ আস্‌সাখতিয়ানী (রহ.) ইত্যাদি।[৭৮]

ইমাম মালিক (রহ.)-এর ছাত্র বৃন্দ : ইমাম মালিক (রহ.) হলেন ইমামু দারিল হিজরাহ, অর্থাৎ মদীনার ইমাম। অতএব মদীনার ইমামের

---

[৭৬] তারতীবুল মাদারিক, ১/১১৯ পৃঃ।
[৭৭] সিয়ারা আলামুন্নুবালা, ৮/৪৯ পৃঃ।
[৭৮] সিয়ারু আলামুন্নুবালা, ৮/৪৯-৫১ পৃঃ।

ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য কে না চায়। তাই তাঁর ছাত্র অগণিত। ইমাম যাহাবী উল্লেখযোগ্য ১৬৬ জনের নাম বর্ণনা করেছেন। ইমাম খাতীব বাগদাদী ৯৯৩ জন উল্লেখ করেন।[৭৯] ইমামের প্রসিদ্ধ কয়েকজন ছাত্রের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল :

১. ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্‌রীস আশ্‌শাফেঈ (রহ.)।

২. ইমাম সুফাইয়ান বিন উয়ায়নাহ (রহ.)।

৩. ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহ.)।

৪. ইমাম আবু দাউদ আত্‌তায়ালিসী (রহ.)।

৫. হাম্মাদ বিন যায়দ (রহ.)।

৬. ইসমাঈল বিন জাফর (রহ.)।

৭. ইবনু আবী আযযিনাদ (রহ.) ইত্যাদি।[৮০]

জ্ঞান গবেষণায় ইমাম মালিক (রহ.) : ইমাম মালিক (রহ.) জন্মগতভাবেই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। মেধা শক্তি ছিল খুবই প্রখর। আবূ কুদামাহ বলেন : "ইমাম মালিক স্বীয় যুগে সর্বাধিক মেধা শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।[৮১]

হুসাইন বিন উরওয়াহ হতে বর্ণিত : তিনি বলেন : "ইমাম মালিক বলেন : একদা ইমাম যুহরী (রহ.) আমাদের মাঝে আসলেন, আমাদের সাথে ছিলেন রাবীয়াহ। তখন ইমাম যুহরী (রহ.) আমাদেরকে চল্লিশের কিছু অধিক হাদীস শুনালেন। অতঃপর পরেরদিন আমরা ইমাম যুহরীর কাছে আসলাম, তিনি বললেন : কিতাবে দেখ আমরা কি পরিমান হাদীস পড়েছি, আরো বললেন, গতকাল আমরা যে হাদীস বর্ণনা করেছি, তোমরা কি কিছু পড়েছ? তখন রাবীয়া বললেন : হ্যাঁ, আমাদের মাঝে এমনও ব্যক্তি আছেন যিনি গতকাল আপনার বর্ণনাকৃত সব হাদীস মুখস্ত শুনাতে পারবেন। ইমাম যুহরী বললেন : কে তিনি? রাবিয়া বললেন : তিনি ইবনু

---

[৭৯] তারতীবুল মাদারিক, ১/২৫৪ পৃঃ। সিয়ারু আলামুন্নুবালা, ৮/৫২ পৃঃ।
[৮০] সিয়ারু আলামুন্নুবালা, ৮/৫২-৫৪ পৃঃ।
[৮১] আত্-তামহীদ, ১/৮১ পৃঃ।

আবী আমীর অর্থাৎ ইমাম মালিক। ইমাম যুহ্‌রী বললেন : হাদীস শুনাও, ইমাম মালিক বলেন : আমি তখন গতকালের চল্লিশটি হাদীস মুখস্ত শুনালাম। ইমাম যুহ্‌রী বলেন : আমার ধারণা ছিল না যে, আমি ছাড়া এ হাদীসগুলো এভাবে আর দ্বিতীয় কেউ মুখস্ত করেছে।[৮২]

অতএব ইমাম মালিক (রহ.)-এর অসাধারণ পাণ্ডিত্বের সাথে গভীরভাবে জ্ঞান গবেষণা ও সংরক্ষণ সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না।

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম মালিক (রহ.) : হাদীস শাস্ত্রে ইমাম মালিক (রহ.) এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, হাদীস সংকলনে অগ্রনায়ক। যদিও তাঁর পূর্বে কেউ কেউ হাদীস সংকলন করেন, যেমন ইমাম যুহ্‌রী, কিন্তু ইমাম মালিক (রহ.)-এর হাদীসের সাধনা, সংগ্রহ ও সংকলন ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এজন্যই তাঁর সংকলিত গ্রন্থকে বলা হয়,

أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى الموطا لمالك

"আল্লাহর কিতাব কুরআনের পর সর্ববিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ ইমাম মালিকের মুয়াত্ত্বা গ্রন্থ।[৮৩]

তিনি হাদীস শিক্ষায় পারিবারিকভাবে উৎসাহী হলেও তাঁর অসাধ্য সাধন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অনেক অগ্রসর হয়েছেন। শয়নে স্বপনে সব সময় একই চিন্তা, কিভাবে তিনি হাদীস শিক্ষালাভ করবেন। মানুষ যখন অবসরে তখন তিনি হাদীসের সন্ধানে। ইমাম মালিক একদা ঈদের সালাতে ইমাম যুহ্‌রীকে পেয়ে মনে করলেন, আজ মানুষ ঈদের আনন্দে ব্যস্ত, হয়ত ইমাম যুহ্‌রীর কাছে একাকী হাদীস শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যাবে। ঈদের ময়দান হতে চললেন ইমাম যুহ্‌রীর বাসায়, দরজার সামনে বসলেন, ইমাম ভিতর থেকে লোক পাঠালেন গেটে দেখার জন্য, ইমামকে জানানো হল যে, গেটে আপনার ছাত্র মালিক, ইমাম বললেন : ভিতরে আসতে বল। ইমাম মালিক বলেন, আমি ভিতরে গেলাম। আমাকে

---

[৮২] আত্‌তাহীদ, ১/৭১ পৃঃ, তারতীবুল মাদারিক, ১/১২১ পৃঃ।
[৮৩] আত্‌তামহীদ, ১/৭৬-৭৯ পৃঃ, আল-হুলিয়াহ, ৬/৩২৯ পৃঃ, অবশ্য এ মন্তব্য সহীহ বুখারীর পূর্বে, সহীহ বুখারী সংকলনের পর বুখারী সর্ববিশুদ্ধ গ্রন্থ।

জিজ্ঞাসা করলেন, মনে হয় তুমি সালাতের পর বাড়ীতে যাওনি? আমি বললাম : হ্যাঁ যাইনি, জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু খেয়েছ কি? আমি বললাম : না, তিনি বললেন : খাও, আমি বললাম : খাওয়ার চাহিদা নেই। তিনি বললেন, তাহলে তুমি কি চাও? আমি বললাম : আমাকে হাদীস শিখান, অতঃপর তিনি আমাকে সতেরটি হাদীস শিখালেন।[৮৪]

ইমাম মালিক (রহ.) বেশীভাগ সময় একাকী থাকা পছন্দ করতেন, তাঁর বোন পিতার কাছে অভিযোগ করলেন, আমাদের ভাই মানুষের সাথে চলাফিরা করে না। পিতা জবাব দিলেন : মা তোমার ভাই রাসূল ﷺ-এর হাদীস মুখস্ত করায় ব্যস্ত, তাই একাকী থাকা পছন্দ করে।[৮৫]

হাদীস সংগ্রহে কঠোর সতর্কতা : ইমাম মালিক (রহ.) হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহে সদা ব্যস্ত হলেও যেখানেই বা যার কাছেই হাদীস পেলে তিনি তা গ্রহণ করতেন না, যতক্ষণ না হাদীস বর্ণনাকারীর ঈমান-আক্বীদাহ ও সততা সম্পর্কে অবগত হতে পারতেন। বিশ্বস্ত প্রমাণিত হলে হাদীস গ্রহন করতেন। ইমাম সুফাইয়ান ইবনু উইয়ায়না (রহ.) বলেন : رحم الله مالكا ما كان أشد انتقاده للرجال والعلماء "আল্লাহ তা'আলা ইমাম মালিককে রহম করুন, তিনি হাদীসের বর্ণনাকারীর ব্যাপারে খুব কঠিনভাবে যাচাই বাছাই করতেন (সহজেই কারো হাদীস গ্রহণ করতেন না)।" আলী বিন মাদীনী (রহ.) বলেন : "হাদীস গ্রহণে কঠোর নীতি ও সতর্কতায় ইমাম মালিকের ন্যায় আর কেউ আছে বলে আমি জানিনা।"[৮৬] ইমাম মালিক বিদ'আতীদের থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন না।[৮৭] এ সতর্কতা শুধু তিনি নিজেই অবলম্বন করেন নি, বরং তিনি অন্যদেরকেও গুরুত্বারোপের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ، لَقَدْ أَدْرَكْتُ سَبْعِيْنَ مِمَّنْ يُحَدِّثُ : قَالَ فُلَانٌ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَمَا أَخَذْتُ عَنْهُمْ شَيْئًا........

---

[৮৪] তারতীবুল মাদারিক, ১/১২১ পৃঃ।
[৮৫] তারতীবুল মাদারিক, ১/১১৯ পৃঃ।
[৮৬] আল ইরশাদ লিল খালিলী, ১/১১০-১১২ পৃঃ।
[৮৭] আল মুহাদ্দিস আল ফাসিল, (৪১৪-৪১৬) পৃঃ, আল ইনতিকা ১৬ পৃঃ, আত্-তামহীদ, ১/৬৭ পৃঃ।

"হাদীস হল দ্বীনের অন্যতম বিষয়, অতএব ভালভাবে লক্ষ কর তোমরা কার নিকট হতে দ্বীন গ্রহণ করছ। আমি সত্তর জন এমন ব্যক্তি পেয়েছি যারা রাসূল ﷺ-এর নামে হাদীস বর্ণনা করে, কিন্তু আমি তাদের কিছুই গ্রহণ করিনি। যদিও তারা অর্থ সম্পদে আমানতদার হয়, কিন্তু এ বিষয়ে তাদেরকে আমি যোগ্য মনে করিনি। অথচ আমাদের মাঝে ইমাম যুহরীর আগমন হলে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহে আমরা তাঁর দরবারে ভীর জমাতাম।[৮৮]

সুতরাং ইমামু দারিল হিজরা বা মাদীনার ইমাম মালিক (রহ.) রাসূল ﷺ-এর হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহে যেমন জীবন উৎসর্গ করেছেন, তেমনি হাদীস সংরক্ষণে খুব কঠোর ভূমিকা রেখেছেন। جزاه الله أحسن الجزاء

হাদীস পালনে ইমাম মালিক (রহ.) : হাদীস শুধু কিতাবের পাতায় নয়, বরং তা বাস্তবে পালনের অন্যতম দৃষ্টান্ত হলেন ইমাম মালিক (রহ.)। আব্দুল্লাহ বিন বুকাইর বলেন ঃ আমি ইমাম মালিককে বলতে শুনেছি তিনি বলেন : "আমি কোন আলিমের কাছে যখন বসেছি। অতঃপর তার কাছ হতে বাড়ীতে আসলে তার কাছে শুনা সব হাদীস মুখস্ত করে ফেলি এবং ওই হাদীসগুলির মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত বা আমল না করা পর্যন্ত ওই আলিমের বৈঠকে ফিরে যাইনি।"[৮৯]

হাদীস শিক্ষাদান ও ফতোয়া প্রদান : ইমাম মালিক (রহ.) শুধু হাদীস শিক্ষা ও আমল করেই ক্ষান্ত হননি, বরং শিক্ষার পাশাপাশি মানুষকে শিক্ষা দান ও ফতোয়া প্রদানে বিড়াট অবদান রেখেছেন। ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন : ইমাম মালিক (রহ.) ২১ বছর বয়সে হাদীসের পাঠদান ও ফতোয়া প্রদানে পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করেন।[৯০] ইমাম মালিক (রহ.) বলেন : ইচ্ছা করলেই শুধু হাদীস শিক্ষা ও ফতোয়া প্রদানের জন্য মসজিদে বসা যায় না, রবং এ ক্ষেত্রে যোগ্য ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিতে হবে, তারা যদি উপযুক্ত মনে করেন তাহলে এ কাজের জন্য

---

[৮৮] আল মুহাদ্দিস আল ফাসিল, (৪১৪-৪১৬) পৃঃ, আল ইনতিকা ১৬ পৃঃ, আত্-তামহীদ, ১/৬৭ পৃঃ।
[৮৯] ইত্হাফুস সালিক দ্রঃ মানহাজু ইমাম মালিক, ৩৪ পৃঃ।
[৯০] সিয়ারু আলামিন্নুবালা, ৮/৫৫ পৃঃ।

নিয়োজিত হতে পারে। সত্তর জন বিজ্ঞ পণ্ডিত- শাইখের আমার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানের পর আমি এ কাজে নিয়োজিত হই।"[৯১] মুস্'আব বিন আব্দুল্লাহ বলেন : "ইমাম মালিককে কোন হাদীস জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি অযূ করে ভাল পোষাক পড়ে সুন্দরভাবে প্রস্তুতি নিতেন, তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাবে বলেন : এ হল রাসূল ﷺ-এর হাদীসের জন্য সম্মান প্রদর্শন।"[৯২] সারা মুসলিম বিশ্ব হতে শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র মদীনায় জ্ঞান পিপাসুরা শিক্ষার জন্য পাড়ি জমান এবং ইমাম মালিকের মত মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস শিক্ষালাভ করে ধন্য হতেন।

ইমাম মালিক (রহ.) ফতোয়া প্রদানেও যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করতেন। জটিল বিষয়গুলো দীর্ঘ গবেষণার পর ফতোয়া প্রদান করতেন। ইবনু আব্দুল হাকীম বলেন : "ইমাম মালিককে (রহ.) কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি প্রশ্নকারীকে বলতেন যাও আমি ওই বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করি।" আব্দুর রহমান বিন মাহদী বলেন : ইমাম মালিক বলেন, "কখনও এমন মাস'আলা এসেছে যে, চিন্তা-গবেষণা করতে আমার গোটারাত কেটেগেছে।"[৯৩] ইমাম মালিক (রহ.) কোন বিষয় উত্তর না দেয়া ভাল মনে করলে "জানি না" বলতেও কোন দ্বিধাবোধ করতেন না।[৯৪] কারণ তিনি মনে করতেন প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া মানে জান্নাত ও জাহান্নামের সম্মুখীন হওয়া। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যেন আখিরাতে জবাব দিহিতার সম্মুখীন হতে না হয়।[৯৫]

সঠিক আক্বীদাহ বিশ্বাসে ইমাম মালিক (রহ.) : আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্বীদাহ-বিশ্বাসের অন্যতম ইমাম হলেন ইমাম মালিক (রহ.)। বিশেষ করে আল্লাহ তা'আলার সিফাত গুণাবলীর প্রতি ঈমানের যে ক্বায়দা বা নীতি ইমাম মালিক (রহ.) মুতাযিলাদের প্রতিবাদে বর্ণনা করেন, সেটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নীতি। যেমন ইমাম ইবনু আবিল ইয্ আল হানাফী শারহুল আক্বীদাহ আত তাহাবিয়ায়

---

[৯১] আল-হুলিইয়্যাহ, ৬/৩১৬ পৃঃ।

[৯২] তার তীবুল মাদারিক, ১/১৫৪ পৃঃ।

[৯৩] আল ইনতিকা, ৩৭-৩৮ পৃঃ।

[৯৪] তাযুইনুল মামালিক, ১৬-১৭ পৃঃ।

[৯৫] আল ইনতিকা, ৩৭ পৃঃ।

উল্লেখ করেন।[৯৬] কুরআনুল কারীম ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে ইমাম মালিক (রহ.) ঈমান আক্বীদাহর সকল বিষয়ে হকপন্থীদের সাথে একমত ছিলেন।[৯৭]

ইমাম মালিক (রহ.) সম্পর্কে আলিম সমাজের প্রশংসা :

১. ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন : "আলিম সমাজের আলোচনা হলে ইমাম মালিক তাদের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র, কেউ ইমাম মালিকের স্মৃতিশক্তি, দৃঢ়তা, সংরক্ষণশীলতা ও জ্ঞানের গভীরতার সমপর্যায় নয়। আর যে ব্যক্তি সহীহ্ হাদীস চায় সে যেন ইমাম মালিকের কাছে যায়।"[৯৮]

২. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন : "বিদ্যানদের অন্যতম একজন ইমাম মালিক, তিনি হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে একজন অন্যতম ইমাম, জ্ঞান-বুদ্ধি ও আদাব আখলাকসহ হাদীসের প্রকৃত অনুসারী ইমাম মালিকের মত আর কে আছে?"[৯৯]

৩. ইমাম নাসাঈ (রহ.) বলেন : "তাবেঈদের পর আমার কাছে ইমাম মালিকের চেয়ে অধিক বিচক্ষণ আর কেউ নেই এবং হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে অধিক আমানতদার আমার কাছে আর কেউ নেই।"[১০০]

ইমাম মালিকের (রহ.) গ্রন্থাবলী ঃ ইমাম মালিক (রহ.)-এর বেশ কিছু রচনাবলী রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল :

(১) আল মুয়াত্তা- الموطأ।[১০১] হাদীসের জগতে কিছু ছোট ছোট সংকলন শুরু হলেও ইমাম মালিকের 'মুয়াত্তা' সর্ব প্রথম হাদীসের উল্লেখযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য সংকলন। এ গ্রন্থে ইমাম মালিক (রহ.) রাসূল ﷺ-এর হাদীস, সাহাবী ও তাবেঈদের হাদীস এবং মদীনাবাসীর ইজমা সহ অনেক ফিকহী মাসআলা বিশুদ্ধ সনদের আলোকে সংকলন করেন।

---

[৯৬] শারহুল আক্বীদাহ আত তাহাবীয়াহ, ১/১৮৮ পৃঃ।

[৯৭] বিস্তারিত দ্রঃ মানহাজুল ইমাম ফি ইছবাতিল আক্বীদাহ- ডঃ সউদ বিন আব্দুল আযীয আদ দা'জান।

[৯৮] আল ইনতিকা, ২৩, ২৪ পৃঃ।

[৯৯] তারতীবুল মাদারিক, ১/১৩৩ পৃঃ।

[১০০] আল্ ইনতিকা, ৩১ পৃঃ।

[১০১] তানবীরুল হাওয়ালিক, ১/৭ পৃঃ।

তিনি দীর্ঘদিন সাধনার পর, কেউ বলেন চল্লিশ বৎসর সাধনার পর এ মূল্যবান গ্রন্থ সংকলন করেন। সে সময় বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে হাদীসের গ্রন্থ 'মুয়াত্তা' খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন : "কিতাবুল্লাহ্ অর্থাৎ কুরআন এর পরই সর্ব বিশুদ্ধ গ্রন্থ হল ইমাম মালিকের "মুয়াত্তা"।[১০২] হ্যাঁ, সহীহ বুখারীর সংকলনের পূর্বে মুয়াত্তাই সর্ব বিশুদ্ধ গ্রন্থ ছিল। অবশ্য এখন সহীহ বুখারী সর্ববিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ।

২. "কিতাবুল মানাসিক", [১০৩]

৩. "রিসালাতুন ফিল কাদ্‌র ওয়ার্‌রাদ আলাল কাদারিয়া"।[১০৪]

৪. "কিতাব ফিন্নুজুমি ওয়া হিসাবি মাদারিয্‌যামানি ওয়া মানাযিলিল কামারি"।[১০৫]

৫. "কিতাবুস্‌সিররি"।[১০৬]

৬. "কিতাবুল মাজালাসাত"।[১০৭] ইত্যাদি সহীহ্ সনদে প্রমাণিত যে, এ সব ইমাম মালিক (রহ.)-এর সংকলিত ও রচিত গ্রন্থ। ইহা ছাড়াও আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে।[১০৮]

ইমাম মালিক (রহ.)-এর মৃত্যুবরণ : ইমাম মালিক (রহ.) ১৭৯ হিঃ রবিউল আউয়াল মাসে ৮৬ বছর বয়সে মদীনা মুনাওয়ারায় মৃত্যুবরণ করেন। এবং তাকে মদীনার কবরস্থান "বাকী"তে দাফন করা হয়।[১০৯] আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন। আমীন!

---

[১০২] তারতীবুল মাদারিক, ১/১৯১-১৯৬ পৃঃ, আত্‌তামহীদ, ১/৭৬-৭৯ পৃঃ।
[১০৩] তায্‌ইনুল মামালিক, ৪০ পৃঃ, মালিক লি আমীন আল খাওলী, ৭৪৫ পৃঃ।
[১০৪] তারতীবুল মাদারিক, ১/২০৪ পৃঃ, সিয়ারু আলামুন্নুবালা, ৮/৮৮ পৃঃ।
[১০৫] তারতীবুল মাদারিক, ১/২০ ৫ পৃঃ, সিয়ারু আলামুন্নুবালা, ৮/৮৮ পৃঃ।
[১০৬] তারতীবুল মাদারিক, ১/২০৫ পৃঃ, সিয়ারু আলামুন্নুবালা, ৮/৮৯ পৃঃ।
[১০৭] তাযইনুল মামালিক, ৪০ পৃঃ, মালিক লি আমীন আল খাওলী, ৭৪৬ পৃঃ।
[১০৮] মানহাজু ইমাম মালিক ফি ইছবাতিল আকীদাহ, ৫১-৫৫ পৃঃ।
[১০৯] আত্‌তামহীদ, ১/৯২ পৃঃ, তারতীবুল মাদারিক, ২/২৩৭-২৪১ পৃঃ, সিয়ারু আলামিন্নুবালা, ৮/১৩০-১৩৫ পৃঃ।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম, উপনাম ও বংশ পরিচয় : নাম : মুহাম্মদ, পিতা ইদ্রিস, দাদা আব্বাস, উপনাম আবূ আব্দুল্লাহ্, বংশ নামা : মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস বিন আব্বাস বিন উসমান বিন শাফি'----- আল কুরাশী আল শাফেয়ী আল মাক্কী।[১১০] ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর বংশ- কুরাইশ বংশের অন্যতম "আব্দে মানাফ বিন কুসাই" এর কাছে মিলিত হয়েছে, তাই ইমাম শাফেয়ীর বংশের মূল এবং রাসূল ﷺ-এর বংশ একই। এ জন্য তিনি আল-মুত্তালাবী বলে পরিচিত, তিনি কুরাইশ বংশের তাই কুরাশী এবং তাঁর দাদা "শাফে" (রা.) সাহাবী এর দিকে সম্পৃক্ত করায় শাফেয়ী, মক্কায় প্রতিপালিত হওয়ায় মাক্কী বলে পরিচিতি লাভ করেন।[১১১]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর উপাধি হল, "নাসিরুল হাদীস" হাদীসের সাহায্যকারী বা সহায়ক, কারণ হাদীস সংগ্রহ, সংকলন, বিশেষ করে হাদীসের যাচাই-বাছাইয়ে তিনি সর্ব প্রথম অবদান রাখেন, তিনিই সর্ব প্রথম হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালা প্রণয়নে কলম ধরেন "আররিসালাহ্ ও আল উম্ম" গ্রন্থদ্বয়ে। অতঃপর সে পথ ধরেই পরবর্তী ইমামগণ অগ্রসর হন।[১১২]

জন্ম, প্রতিপালন ও শিক্ষা জীবন : সকল ঐতিহাসিকের মতে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ১৫০ হিঃ সনে জন্ম গ্রহণ করেন, যে সনে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ.) ইন্তেকাল করেন।[১১৩]

ইমামের জন্মস্থান সম্পর্কে কিছু মতামত পরিলক্ষিত হয় কেউ বলেন গাযা নামক স্থানে,[১১৪] কেউ বলেন আসকালান শহরে[১১৫] আবার কেউ

---

[১১০] তাওয়াল্লী তাসীস, ৩৪ পৃঃ, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, যাহাবী, ১/৩২৯ পৃঃ, সিয়ার আলামুন্নুবালা, ১০/৫ পৃঃ, তাহযীবুত্তাহযীব, ৯/২৫ পৃঃ, ম'জামুল উদাবা, ৬/৩৬৭ পৃঃ, হুলিয়াতুল আউলিয়া, ৬/৬৩ পৃঃ ইত্যাদি।

[১১১] আল ইসাবাহ, ২/১১ পৃঃ, তাওয়াল্লী তাসীস, ৩৭ পৃঃ, তারীখে বাগদাদ, ২/৫৮ পৃঃ।

[১১২] মানাকিব বাইহাকী, ১/৪৭২ পৃঃ, তাওয়াল্লী তাসীস, ৪০ পৃঃ, তাইসীর মুসতালাহিল হাদীস, ১০ পৃঃ।

[১১৩] তাওয়াল্লী তাসীস, ৫২ পৃঃ।

[১১৪] মানাকিব বায়হাকী, ২/৭১ পৃঃ।

[১১৫] আদাবুশ্শাফেয়ী, ২১, ২২, ২৩ পৃঃ।

বলেন ইয়ামান দেশে।[১১৬] এ মতবিরোধের সমাধানে ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন : গাযা ও আসকালান এ দু'টি পাশাপাশি এলাকা, মূলতঃ আসকালান প্রসিদ্ধ নগরী এরই অন্তর্গত (তৎকালীন) একটি এলাকা/গ্রাম গাযা সেখানেই ইমাম শাফেয়ী জন্মলাভ করেন, তাঁর মা ছিলেন ইয়ামানের প্রসিদ্ধ "আযদিয়্যাহ" গোত্রের, তাই জন্মের দু'বছর পর ছেলে ইয়াতীম হয়ে যাওয়ায় মা ছেলেকে নিয়ে প্রিত্রিকূল ইয়ামানে চলে যান। কয়েক বছর পরেই ইমামের বাবার বংশ কুরাইশ বংশের সম্পর্ক দৃঢ় করার লক্ষ্যে আবার মক্কায় পাড়িজমান। অতএব ইমাম শাফেয়ীর জন্মস্থান সম্পর্কে আর কোন মতভেদ থাকেনা।[১১৭]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ছোট কালেই পিতাকে হারিয়ে ইয়াতীম হয়ে যান, পিতার মৃত্যুর পর অভিভাবকহীনতা ও দারিদ্রতা ইত্যাদি নানা সমস্যার সম্মুখীন হন, পিতা মারা গেলে বিচক্ষণ মা তাকে দু'বছর বয়সে মক্কার পার্শ্ববর্তী নিয়ে আসলে তিনি কুরআন মুখস্ত করায় মনোনিবেশ হন এবং সাত বছর বয়সেই সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্ত করেন।[১১৮] তিনি নিজেই বলেন : আমি যখন মায়ের কাছে ইয়াতীম অসহায়, শিক্ষক দেয়ার মত মায়ের কাছে কিছু নেই এমতাবস্থায় শিক্ষক এর স্থলাভিষিক্তে দায়িত্ব পালনশর্তে পড়াতে রাযি হলে আমি তার কাছে কুরআন মুখস্ত খতম করলাম। অতঃপর মাসজিদে বিভিন্ন আলিমদের কাছে বসে হাদীস ও মাসআলা মুখস্ত করতে লাগলাম এবং কিছু বিষয় হাড়ের টুকরায় লিখে রাখতাম।[১১৯]

তিনি আরো বলেন : আমার বয়স যখন প্রায় দশ বছর তখন মক্কায় জ্ঞান চর্চায় ব্যস্ত থাকা দেখে আমার এক আত্মীয় আমাকে বললেন : তুমি একাজ কর না বরং অর্থ উপার্জনের পথধর। তিনি বলেন আমি তার কথায় কান দিলাম না বরং শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চায় আমি আরো মগ্ন হলাম ফলে আল্লাহ্ আমাকে এসব জ্ঞান দান করেছেন।[১২০]

---

[১১৬] আদাবুশ্শাফেয়ী, ২১, ২২, ২৩ পৃঃ।
[১১৭] তাওয়ালী তাসীস, ৫১, ৫২ পৃঃ।
[১১৮] মানহাজ ইমাম শাফেয়ী ফি ইছবাতিল আকীদাহ, ১/২৩ পৃঃ।
[১১৯] তাওয়ালী তাসীস, ৫৪ পৃঃ।
[১২০] তাওয়ালী তাসীস, ৫৩ পৃঃ।

তিনি ছোট কাল হতে শিক্ষানুরাগী এবং কঠোর জ্ঞান সাধনার ফলে সাত বছরে কুরআনের হাফেয এবং দশ বছরে মুয়াত্তা হাদীস গ্রন্থ হিফয করে পনের বা আটার বছর বয়সে ফাতাওয়া প্রদান শুরু করেন। সাথে সাথে মক্কায় আরবী পণ্ডিতদের কাছে আরবী কবিতা ও ভাষা জ্ঞানে পূর্ণ পাণ্ডিত্ব লাভ করেন।[১২১]

শিক্ষা সফর : মহা মনীষী জ্ঞানপিপাসু ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর এক ব্যক্তি বা অঞ্চল হতে জ্ঞান শিক্ষা করে পিপাসা নিবারণ হয়নি, তাই তিনি এক ব্যক্তি হতে আরেক ব্যক্তি এবং এক অঞ্চল হতে আরেক অঞ্চলে জ্ঞানারহনে ভ্রমণ করেছেন, সাথে সাথে দ্বীন ও জ্ঞান প্রচার ও প্রসারেরও কোন কমতি হয়নি।

মদীনা সফর : সর্ব প্রথম তিনি মদীনা সফর করেন এবং মদীনার ইমাম, ইমাম মালিকের সংকলিত গ্রন্থ মুয়াত্তা মুখস্ত করে তাঁকে শুনান, ইমাম শাফেয়ীর ছোট বয়সে এই প্রজ্ঞা ও প্রতিভা দেখে তিনি অভিভূত হন। ইমাম মালিক (রহ.) যত দিন বেঁচে ছিলেন ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ততদিন তাঁর সঙ্গ ছেড়েন নি, তাই মুয়াত্তা ছাড়াও আরো অনেক কিছু তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেন।[১২২]

মদীনার পর তিনি ইয়ামানে শিক্ষার উদ্দেশ্যে বের হন। সেখানে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। জনসমাজে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে তিনি বিদ্বেষিদের চক্রান্তে পড়েন, ফলে তিনি ইয়ামান ত্যাগ করে আবার মক্কায় ফিরে আসেন।[১২৩]

ইরাক সফর : ইমাম শাফেয়ী ইরাকে দু'বার সফর করেন, প্রথমবার রাজনৈতিক কারণে খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁকে ইরাকে জোরপূর্বক পাঠান, যেভাবেই হোক, সেখানে গিয়ে তিনি ইরাকের প্রসিদ্ধ জ্ঞানীদের নিকট শিক্ষা সমাপন করে আবার মক্কায় ফিরে আসেন এবং পূর্ণদমে দরস-তাদরীস ও ইসলাম প্রচার-প্রসারের কাজে একটানা নয় বছর আত্মনিয়োগ করেন।[১২৪]

---

[১২১] আল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্, ১০/২৬৩ পৃঃ।

[১২২] তাওয়ালী আসীস, ৫৪ পৃঃ।

[১২৩] মানহাজ ইমাম শাফেয়ী ফিল আকীদা, ১/২৯ পৃঃ।

[১২৪] মানহাজুল ইমাম শাফেয়ী ফি ইছবাতিল আকীদাহ- ১/৪৩ পৃঃ।

অতঃপর ১৯৫ হিঃ ইমাম শাফেয়ী আবারো ইরাক সফর করেন, তবে এ সফর পূর্বের ইরাক সফর হতে অনেক ভিন্ন ছিল, প্রথম সফর ছিল জ্ঞান শিক্ষা গ্রহণের আর এ সফর হলো শিক্ষা গ্রহণ পাশাপাশি শিক্ষাদানের জন্য। ইমাম বায়হাকী (রহ.) স্বীয় সনদে আবূ ছাওর হতে বর্ণনা কারেন, তিনি বলেন, যখন ইমাম শাফেয়ী ইরাকে আসলেন তখন রায়পন্থী (আহলুর রায়) হুসাইন কারাবিসী আমার কাছে আসলেন এবং বললেন যে, আমাদের মাঝে একজন হাদীস পন্থী (আহলে হাদীস) এসেছেন চল আমরা তার কাছে গিয়ে একটু হাসি-ঠাট্টা করি।

আবূ ছাওর বলেন : আমরা তাঁর কাছে গেলাম, হুসাইন ইমামকে এক মাসআল জিজ্ঞাসা করলেন, জবাবে ইমাম সাহেব "আল্লাহ্ তা'আলা বলেন এবং রাসূল ﷺ বলেন" এভাবে প্রচুর কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি উপস্থাপনের মাধ্যমে জবাব দিতে থাকলেন এভাবে রাত হয়ে গেল, তখন আমরা তাঁর কুরআন ও হাদীসের অগাধ পাণ্ডিত্ব দেখে আশ্চর্য হলাম, শেষটায় আমাদের রায় ও কিয়াসের বিদ'আত বর্জন করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করলাম।[১২৫] এ সফরেই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) ইমাম শাফেয়ীর সাক্ষাৎ করেন।

মিসর দেশে সফর : ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ইরাকে অবস্থান যেমনি প্রশংসনিয়, তেমনি আবার অপরদিক হতে কালো মেঘ নেমে আসতে লাগল। মুতাযিলা আলিমরা রাজনৈতিক প্রাঙ্গণ দখল করায় খলীফা হারুণসহ সে সময়ের আব্বাসীয় খলীফাগণ ফালসাফা ও তর্কবিদ্যা-মানতিকে প্রভাবিত হয়ে কুরআন মাখলুক (সৃষ্ট) ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের ইমাম- ইমাম আহমাদ, ইমাম শাফেয়ী এবং যারা বিদ'আত মুক্ত সঠিক আকীদাহ্ বিশ্বাসের ধারক-বাহক তাদের উপর নির্যাতন শুরু করে, যার ফলে বাধ্য হয়ে ইমাম শাফেয়ী ইরাক ত্যাগ করে মিসরে পারি জমান।[১২৬]

মিসরে আগমন করলেই মিসরবাসী সানন্দে সাগতম জানান, মিসরের বড় মসজিদ - আমর বিন আল আস মসজিদে কিছু আলোচনা পেশ করলে

---

[১২৫] মানাকিব বাইহাকী- ১/২২০ পৃঃ।
[১২৬] মানাকিব বাইহাকী, ১/৪৬৩-৪৬৫ পৃঃ।

সকলেই তাঁর আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে যান, এবং তারা এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, মিসরের বুকে এমন প্রতিভাবান ব্যক্তির কখনও আগমন ঘটেনি, যিনি কুরাইশ বংশোদ্ভূত, যার সালাতের ন্যায় উত্তম সালাত আদায় করতে কাউকে দেখিনি, যার চেহারার ন্যায় সুন্দর চেহারা খুব কমই আছে, যার বক্তব্য ও বাচন ভঙ্গির মত আকর্ষণীয় ও শ্রুতিমধুর কাউকে দেখিনি।[১২৭]

তাঁর হাদীস গবেষণা ও চর্চায় যারা হানাফী বা মালিকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তার অনেকেই হাদীসের আলোকে ইসলাম চর্চার সুযোগ লাভে ধন্য হন। ইমাম শাফেয়ী জীবনের শেষ পর্যন্ত মিসরেই অবস্থান করেন এবং তাঁর মূল্যবান গ্রন্থসমূহ সেখানেই সংকলন করেন।[১২৮]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর শিক্ষকবৃন্দ : ইমাম শাফেয়ী (রহ.) স্বীয় যুগে বিভিন্ন দেশে অগণিত আলিম হতে শিক্ষালাভ করেন, ইমাম বায়হাকী, ইবনু কাছীর, মিয্যী, মুযানী ও ইবনু হাজার আসকালীন স্বীয় গ্রন্থসমূহে ইমামের শিক্ষক বৃন্দের বিস্তারিত অলোচনা করেছেন তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ[১২৯]

(১) ইমাম সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ (রহ.) (মৃত: ১৯৮ হিঃ) (মাক্কী)।
(২) ইমাম ইসমাঈল বিন আব্দুল্লাহ (রহ.) (মৃত: ১৭০ হিঃ) (মাক্কী)।
(৩) ইমাম মুসলিম বিন খালিদ (রহ.) (মৃত: ১৭৯ হিঃ) (মাক্কী)।
(৪) ইমাম মালিক বিন আনাস (রহ.) (মৃত: ১৭৯ হিঃ) (মাদানী)।
(৫) ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল (রহ.) (মৃত: ২০০ হিঃ) (মাদানী)।
(৬) ইমাম হিশাম বিন ইউসুফ (রহ.) (মৃত: ১৯৭ হিঃ) (ইয়ামানী)।
(৭) ইমাম ওয়াকী বিন আল জাররাহ্ (রহ.) (মৃত: ১৯৭ হিঃ) (কুফী)।

এ ছাড়াও আরো অসংখ্য বিদ্বান ইমাম শাফেয়ীর শিক্ষক।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ছাত্রবৃন্দ : ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ছাত্র হওয়ার যারা সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাদের সংখ্যা ও বর্ণনা দেয়া

---

[১২৭] মানাকিব বাইহাকী, ২/২৮৪ পৃঃ।
[১২৮] মানাকিব বাইহাকী, ২/২৯১ পৃঃ।
[১২৯] আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১০/২৬৩ পৃঃ।

অসম্ভব, কারণ তিনি যে দেশেই ভ্রমণ করেছেন এবং শিক্ষার আসরে বসেছেন সেখানেই অগণিত ছাত্র তৈরী হয়েছে, নিম্নে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হলঃ

(১) ইমাম রাবী বিন সুলায়মান আল মাসরী।

(২) ইমাম ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া আল মুযানী আল মাসরী।

(৩) ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ্ আলফাকীহ আল মাসরী।

(৪) ইমাম আবূ ইয়াকূব ইউসুফ বিন ইয়াহইয়া আল মাসরী।

(৫) ইমাম আবুল হাসান বিন মুহাম্মদ আয্যাফরানী।

এ ছাড়া অগণিত, অসংখ্য ছাত্র রয়েছে যাদের সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।[১৩০]

ইমাম শাফেয়ী সম্পর্কে আলিম সমাজের প্রশংসা : সত্যকে সত্য বলাই হলো ন্যায় বিচার, ইমাম শাফেয়ীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, আল্লাহ ভীরুতা ও সত্যের দাওয়াতের যথার্থতা বর্ণনায় কেউ কম করেন নি, যারা ন্যায়কে ন্যায় বলেছেন তন্মধ্যে :

(১) ইমামুল মাদীনাহ- ইমাম মালিক (রহ.) বলেন : "আমি এ যুবক (ইমাম শাফেয়ী)-এর মত অধিক বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান আর কোন কোরাইশীকে পাইনি।"[১৩১]

(২) ইমাম আবূল হাসান আয্যাফরানী বলেন : "আমি ইমাম শাফেয়ীর ন্যায় অধিক সম্মানী, মর্যাদাশীল, দানশীল, আল্লাহ ভীরু দ্বীনদার ও অধিক জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি।"[১৩২]

(৩) ইমাম ইসহাক বিন রাহ্উয়াহ (রহ.) বলেন : আমি ইমাম আহমাদ (রহ.) সহ মক্কায় ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর কাছে গেলাম, তাঁকে বেশ কিছু জিজ্ঞাসা করলাম তিনি খুব ভদ্রতার সাথে সাবলীল ভাষায় প্রশ্নের জবাব দিলেন। অতঃপর আমাদের চলে আসার সময় একদল কুরআনের

---

[১৩০] মানাকিব বাইহাকী, ২/৩২৪ পৃঃ। তাহযীবুল কামাল, ৩/১১৬১।

[১৩১] তাওয়ালী তাসীস, ৭৪ পৃঃ।

[১৩২] তাওয়ালী তাসীস, ৮০ পৃঃ।

আলিম বললেন : ইমাম শাফেয়ী হলেন স্বীয় যুগে কুরআনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী মানুষ।" ইমাম ইসহাক বলেন : আমি যদি তাঁর কুরআনের পাণ্ডিত্ব সম্পর্কে আগে অবগত হতাম তাহলে তাঁর কাছে শিক্ষার জন্য থেকে যেতাম।"[১৩৩]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর রচিত গ্রন্থাবলী : প্রসিদ্ধ চার ইমামের মধ্যে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর গ্রন্থাবলী সর্বাধিক, অতঃপর ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর। ইমাম শাফেয়ী অসংখ্য গ্রন্থ রেখে গেছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেমন-

(১) "কিতাবুল উম্ম" মূলতঃ এটি একটি হাদীসের গ্রন্থ, যা ফিকহী পদ্ধতিতে স্বীয় সনদসহ সংকলন করেছেন, এটি একটি বিশাল গ্রন্থ। যাহা ৯টি বড় ভোলিয়মে প্রকাশিত।

(২) "আর রিসালাহ" এটা সেই গ্রন্থ যাতে ইমাম শাফেয়ী উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিকহে সর্বপ্রথম কলম ধরেছেন।

(৩) "আহকামুল কুরআন"।

(৪) "ইখতিলাফুল হাদীস"।

(৫) "সিফাতুল আমরি ওয়ান্নাহী"।

(৬) "জিমাউল ইলম"।

(৭) "বায়ানুল ফারয"।

(৮) "ফাযাইলু কুরাইশ"।

(৯) "ইখতিলাফুল ইরাকিঈন"।

(১০) ইখতিলাফু মালিক ওয়া শাফিয়ী। ইত্যাদি আরো বহু গ্রন্থ রয়েছে।[১৩৪]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর আকীদাহ্-বিশ্বাস : ইমাম শাফেয়ী (রহ.) আহ্‌লিস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের ইমাম, যিনি ছিলেন কুরআন ও সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী, আকীদাহ্-বিশ্বাস, আমল-আখ্‌লাক, ইবাদাত-বন্দেগী সকল ক্ষেত্রে তিনি সব কিছুর উর্দ্ধে কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে প্রাধান্য দিতেন

---

[১৩৩] তাওয়ালী আসীস, ৯০ পৃঃ।

[১৩৪] তাওয়ালী আসীস, ১৫৪ পৃঃ।

এবং আঁকড়েয় ধরতেন, তিনি কালাম পন্থী যুক্তিবাদী বিদ'আতীদের ঘোর বিরোধী ছিলেন, অনুরূপ রায় ও কিয়াস পন্থীদেরও বিরোধী ছিলেন। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আহ্লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের আকীদাহ্-বিশ্বাসই ইমাম শাফেয়ীর আকীদাহ্-বিশ্বাস। এতে কোনই বৈপিরিত্য নেই।[১৩৫]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ইন্তেকাল ঃ ইমাম শাফেয়ীও (রহ.) আল্লাহর নিয়মের বাইরে নন, একই নিয়মে তিনিও এসেছেন আবার সব কিছু রেখে আল্লাহর আহবানে সারা দিয়ে ২০৪ হিজরীর রজব মাসের শেষ দিন জুমআর রাত্রিতে পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করেন।[১৩৬] আল্লাহ্ তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। আমীন!

---

[১৩৫] ইমাম শাফেয়ীর আকীদাহ-বিশ্বাস বিস্তারিত দ্রঃ "মানহাজ আল ইমাম আশ শাফেয়ী ফি ইছবাতিল আকীদাহ্" - ডঃ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব আল আকীল।

[১৩৬] তাওয়ালী তাসীস, ১৭৯ পৃঃ।

ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম, উপনাম ও বংশ পরিচয় : নাম : আহ্মাদ, পিতা মুহাম্মদ, দাদা হাম্বল, উপনাম আবূ আব্দুল্লাহ।

বংশনাম : আহ্মাদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল বিন হিলাল বিন আসাদ বিন ইদ্রীস---- আশ্শায়বানী, আল-মারওয়াযী, আল-বাগদাদী। ইমামের ১৩তম পূর্ব পুরুষ শায়বান এর দিকে সম্পৃক্ত করায় আশ শায়বানী, তাঁর জন্মভূমি মুরউ এর দিকে সম্পৃক্ত করায় আল-মারওয়াযী, অতঃপর ইমামের অবস্থান বাগ্দাদ এর দিকে সম্পৃক্ত কারয় "আল বাগ্দাদী।"[১৩৭]

জন্ম ও প্রতিপালন : ইমাম আহ্মাদ (রহ.) ১৬৪ হিঃ রবিউল আউয়াল মাসে মুরউতে জন্ম গ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন তিনি মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় মুরউ হতে বাগদাদে আসেন অতঃপর বাগদাদে জন্ম হয়। ছোট কালেই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন ফলে তিনি ইয়াতীম অবস্থায় মার কাছে পালিত হন।[১৩৮]

শিক্ষা জীবন : ইমাম আহ্মাদ (রহ.) ছোট বয়সেই শিক্ষায় মনোনিবেশ হন। তিনি প্রখর মেধাশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। অতি সহজেই অনেক কিছু মুখস্ত করে ফেলতেন। ইব্রাহীম আল হারবী (রহ.) বলেন : "মনে হয় যেন আল্লাহ তা'আলা ইমাম আহ্মাদকে আদি-অন্তের সকল প্রকার জ্ঞান দান করেছেন।"[১৩৯]

শিক্ষা সফর : জ্ঞান পিপাসু ইমামুস সুন্নাহ্ ইমাম আহ্মাদ (রহ.) বাগদাদের উল্লেখযোগ্য সকল আলিম হতে শিক্ষা গ্রহণের পর বিভিন্ন প্রান্তে জ্ঞান আহরণে ছুটে চলেন। তিনি সফর করেন কুফা, বাসরা, মক্কা, মদীনা, ত্বারতুস, দামেস্ক, ইয়ামান, মিসর ইত্যাদি অঞ্চলে। তিনি পাঁচবার হাজ্জব্রত পালন করেন তন্মধ্যে তিনবার পায়ে হেঁটে হাজ্জ পালন করেন।[১৪০]

---

[১৩৭] হুলিয়াতুল আউলিয়া- ৯/১৬২ পৃঃ, তাহযীবুল কামাল- ১/৩৫ পৃঃ, তারিখে বাগদাদ- ৪/৪১৪ পৃঃ, সিয়ারু আলামুন্নুবালা- ১১/১৭৮ পৃঃ, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ- ১০/৭৭৫ পৃঃ, মানাক্বিব লি ইবনুল জাওযী- ১৮ পৃঃ, ইত্যাদি।

[১৩৮] সিয়ারু আলাম আননুবালা- ১১/১৭৯ পৃঃ, আলবিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ- ১০/৭৭৫ পৃঃ।

[১৩৯] তুথাফাতুল হানাবিলাহ- ১/৯ পৃঃ, সিয়ারু আলমিনুবালা- ১১/১৮৮ পৃঃ।

[১৪০] মুকাদ্দামাতু কিতাব মাসায়িলি ইমাম আহ্মাদ- ১/২০ পৃঃ।

হাদীসের জগতে ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.) : হাদীসের জগতে ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.) এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, তাঁর হাদীসের পারদর্শিতা সম্পর্কে এক কথায় বলা যায় তিনি হাদীসের এক বিশাল সাগর। ইমাম আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আল ওয়াররাক বলেন, "আমি ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বলের মত আর কাউকে দেখিনি, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনি অন্যের চেয়ে ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.)-এর মাঝে জ্ঞান-গরিমা বা মর্যাদা বেশী কি পেয়েছেন? তিনি বললেন : ইমাম আহ্‌মাদ এমন একজন ব্যক্তি যাকে ৬০,০০০ (ষাট হাজার) প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি সকল প্রশ্নের জবাবে হাদ্দাছানা ওয়া আখাবারানা অর্থাৎ হাদীস হতে জবাব দিয়েছেন অন্য কিছু বলেন নি।"[১৪১] অতএব এক বাক্যে বলা যায় যে, ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.) হাদীসের সাগর ছিলেন। এ ছাড়াও এর জলন্ত প্রমাণ হলো ইমামের সংকলিত সুপ্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ "আল মুসনাদ" যার হাদীস সংখ্যা চল্লিশ হাজার।[১৪২]

অতএব হাদীসের জগতে ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.) এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। হাদীস শাস্ত্রে মুসতালাহ, ঈলাল, আসমাউর রিজাল, জারহ-তাদীল ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। হাদীস শিক্ষাদানেও তাঁর কৃতিত্ব অতুলনীয়, তাঁর একেক মজলিসে পাঁচ হাজারেরও অধিক ছাত্র অংশ গ্রহণ করত।[১৪৩]

আহ্‌লুস সুন্নাহর ইমাম : ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.) সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত কিন্তু প্রকাশ্যভাবে সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা হতে সামান্যতম ছাড় দিতে প্রস্তুত নন, প্রয়োজনে জীবন জেতে পারে তবুও সুন্নাহর অনুসরণ বর্জন হতে পারে না, ইমাম ইসহাক বিন রাহুয়াহ (রহ.) বলেন : "যদি ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল না হতেন এবং তাঁর ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার না হত তাহলে ইসলাম বিনাশ হয়ে যেত, অর্থাৎ যখন সকলেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কুরআনকে মাখলুক হিসাবে স্বীকার করে নিল, তখন পৃথিবীর বুকে একজনই মাত্র ইসলামের সঠিক বিশ্বাস ধারণ

---

[১৪১] ত্বাবাকাতুল হানাবিলাহ, ১/৯ পৃঃ।

[১৪২] তাদবীনুস সুন্নাহ আন্নাবাবীয়্যাহ, ১২২ পৃঃ।

[১৪৩] মুকাদ্দামাহ কিতাব মাসায়িলি ইমাম আহ্‌মাদ, ১/২৪, ২৫ পৃঃ।

করেছিলেন, তিনিই হলেন ইমাম আহ্‌মাদ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাধ্যমেই ইসলামের সঠিক আকীদাহ্ বিশ্বাসকে টিকিয়ে রেখেছিলেন।

রাসূল ﷺ হতে চলে আসা কুরআনের সঠিক বিশ্বাস : "কুরআন আল্লাহ তা'আলার বাণী, কোন সৃষ্ট বস্তু নয়।" কিন্তু জাহমিয়া ও মুতাযিলাদের আবির্ভাবে এ বিশ্বাসে বিকৃতি ঘটানো হয়, শুরু হল "কুরআন মাখলুক বা সৃষ্ট বস্তু" এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রচারণা, এমনকি রাষ্ট্রীয়ভাবে আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর রশীদ এবং পরবর্তী খলীফা মামুনুর রশীদ প্রভাবিত হলেন এ ভ্রান্ত বিশ্বাসে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা হল সকলকে বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, "কুরআন মাখলুক বা সৃষ্ট বস্তু", এ বিশ্বাসের কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না। বাধ্য হয়ে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রায় সকলেই ঐক্যমত পোষণ করলেন শুধুমাত্র দু'জন দ্বিমত পোষণ করেন, ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.) ও মুহাম্মাদ বিন নূহ (রহ.)। নির্দেশ দেয়া হল তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য। গ্রেফতার করে আনার পথে মুহাম্মদ বিন নূহ (রহ.) ইন্তেকাল করেন, আর ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.) দু'আ করেছিলেন যেন খলীফা মামুনের সাথে সাক্ষাৎ না হয়। ইমামকে কারাবাস দেয়া হল, প্রায় আটাস (২৮) মাস কারাগারে আবদ্ধ হয়ে থাকলেন এবং খলীফা মু'তাসিম এর নির্দেশে ইমামকে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ না করায় বেত্রাঘাত করা হল। হাত বেঁধে নিষ্ঠুরভাবে কোড়াঘাত করা হয়। কোড়াঘাতে রক্ত ঝড়তে থাকে, গায়ের কাপড় পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পরে যান, আবার জ্ঞান ফিরলে জিজ্ঞাসা করা হয় তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসে একমত কিনা? একমত না হলে আবার কোড়াঘাত শুরু হয়। এভাবে নির্মম নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হন। এর কারণ শুধু একটিই তিনি কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী এবং বিদ'আতী বিশ্বাস বর্জনকারী। পরিশেষে খলীফা আল মুতাওয়াক্কিল (রহ.) সঠিক বিষয় উপলব্ধি করায় গোটা মুসলিম জাহানে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত অনড়, অটল একক ব্যক্তি ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল (রহ.)-কে কারামুক্ত করেন এবং তাঁকে যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করেন।[১৪৪]

---

[১৪৪] সিয়ারু আলামুন্নুবালা, ১১/২৫০-২৫২ পৃঃ।

ইমামের আকীদাহ্-বিশ্বাস : পৃথিবীর বুকে যখন ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সকলেই মুতাযিলাদের বাতিল আকীদাহ-বিশ্বাস গ্রহণ করে তখন একক ব্যক্তি যিনি কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সঠিক আকীদাহ্ বিশ্বাসের উপর অটল ছিলেন। এমনকি নির্মম, নিষ্ঠুর নির্যাতনেও তিনি সঠিক আকাদীহ্ হতে সামান্যতমও বিচ্যুত হননি। সুতরাং একবাক্যে বলা যায় যে, তিনি সঠিক আকীদায় শুধু বিশ্বাসী নয় বরং সঠিক আকীদায় বিশ্বাসীদের অন্যতম ইমাম ছিলেন।

ইমাম আহ্মাদ (রহ.)-এর শিক্ষকবৃন্দ : ইমাম আহ্মাদ (রহ.) বাগদাদসহ গোটা মুসলিম জাহানের প্রায় সকল শিক্ষা কেন্দ্রে জ্ঞানের সন্ধানে অবতরণ করেন, ফলে তাঁর শিক্ষক হাতে গনা কয়েকজন হতে পারে না বরং তাঁর শিক্ষক অগণিত ও অসংখ্য। ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন : ইমাম আহ্মাদ (রহ.) "মুসনাদে আহ্মাদ" গ্রন্থের হাদীসসমূহ যে সব শিক্ষক হতে গ্রহণ করেন তাঁদের সংখ্যা হলো দুইশত তিরাশি (২৮৩) জন।[১৪৫] এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে বহু সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন। নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকজন শিক্ষকের নাম উল্লেখ করা হল[১৪৬] :

(১) ইমাম সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ (রহ.)।
(২) ইমাম ওয়াকী বিন আল জাররাহ্ (রহ.)।
(৩) ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস আশ্শাফেয়ী (রহ.)।
(৪) ইমাম আব্দুর রায্যাক আস সানআনী (রহ.)।
(৫) ইমাম কুতাইবাহ বিন সাঈদ (রহ.)।
(৬) ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.)।
(৭) ইমাম ইবনু আবী শাইবাহ (রহ.) ইত্যাদি।

ইমাম আহ্মাদ (রহ.)-এর ছাত্র বৃন্দ : ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর ছাত্র অগণিত হওয়াই সাভাবিক, তাদের সংখ্যাও গণনা সম্ভব নয় এবং তালিকাও বর্ণনা সহজ নয়। যিনি লক্ষাধিক হাদীসের হাফেয,

[১৪৫] সিয়ারু আলাম আন্নুবালা, ১১/১৮০ পৃঃ।
[১৪৬] মকাদ্দামাহ্ কিতাব মাসায়িল ইমাম আহ্মাদ, ১/২১ পৃঃ।

চল্লিশ হাজার হাদীস গ্রন্থের সংকলক তাঁর ছাত্র বিশ্বজুড়ে হওয়াই সাভাবিক। যার মাজলিসে পাঁচ হাজার পর্যন্ত ছাত্র থাকত, নিম্নে কয়েকজন নক্ষত্রতুল্য ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হল[১৪৭] :

১. ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল বুখারী (রহ.)।

২. ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশায়রী (রহ.)।

৩. ইমাম আবূ দাউদ আস সিজিস্তানী (রহ.)।

৪. ইমাম আবূ ঈসা অত্‌তিমিযী (রহ.)।

৫. ইমাম আবূ আব্দুর রহমান আন্‌নাসাঈ (রহ.)।

৬. ইমাম সালিহ্ বিন আহ্‌মাদ বিন হাম্বল (রহ.)।

৭. ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন আহ্‌মাদ বিন হাম্বল (রহ.) ইত্যাদি।

ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.)-এর রচনাবলী : প্রসিদ্ধ চারজন ইমামের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশী গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি হলেন ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল (রহ.)। শুধু তাই নয় বরং তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ "মুসনাদ" সর্ব প্রসিদ্ধ। ইমামের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো[১৪৮] :

১. হাদীস গ্রন্থ "আল মুস্‌নাদ" (হাদীস সংখ্যা চল্লিশ হাজার)।[১৪৯]

২. আয্‌যুহ্‌দ।

৩. ফাযায়িলুস সাহাবাহ।

৪. আল ঈলাল ওয়া মারিফাতির রিজাল।

৫. আল ওয়ার'।

৬. কিতাবুস সালাত।

৭. আর্‌রাদ্দ আলাল জাহ্‌মিয়্যাহ।

---

[১৪৭] তাহ্‌যীবুল কামাল, ১/৪৪০-৪৪২ পৃঃ।, সিয়ারু আলামুন্নুবালা, ১১/

[১৪৮] মুকাদ্দিমাতু কিতাব মাসায়িলি ইমাম আহ্‌মাদ, ১/৩০-৩৫ পৃঃ।

[১৪৯] তাদ্‌বীনুস সুন্নাহ আন্‌নাবাবীয়্যাহ, ১২২ পৃঃ।

৮. রিসালাতু ইমাম আহ্‌মাদ।

৯. আল মাসায়িল।

১০. আহ্‌কামুন্নিসা।

১১. কিতাবুল মানাসিক।

১২. কিতাবুস্‌সুন্নাহ, ইত্যাদি।

ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.) সম্পর্কে আলিম সমাজের প্রশংসা :

(১) ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল ﷺ-এর পর দু'জন ব্যক্তির মাধ্যমেই ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একজন হলেন আবূ বকর (রাঃ) যার মাধ্যমে মুরতাদ ও ভণ্ড নাবীদের দমন করেছেন, আর অপরজন আহ্‌মাদ বিন হাম্বল, যার মাধ্যমে কুরআনের মানহানীর সময় কুরআনকে সমুন্নত করেছেন।[১৫০]

(২) ইমাম আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আল ওয়াররাক (রহ.) বলেন : "আমি ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বলের মত আর কাউকে দেখিনি, তাকে জিজ্ঞাসা করা হল আপনি অন্যের চেয়ে ইমাম আহ্‌মাদের মাঝে জ্ঞান-গরিমার বা মর্যাদার বেশী পেয়েছেন কি? তিনি বললেন : ইমাম আহ্‌মাদ এমন একজন ব্যক্তি যাকে ৬০,০০০ (ষাট হাজার) প্রশ্ন করা হল, তিনি সকল প্রশ্নের জবাবে হাদ্দাছানা ওয়া আখ্‌বারানা অর্থাৎ শুধু হাদীস হতে জবাব দিয়েছেন অন্য কিছু বলেন নি।[১৫১]

(৩) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন : আমি বাগদাদ হতে বের হয়ে ইমাম আহ্‌মাদের চেয়ে অধিক আল্লাহভীরু, তাকওয়াশীল, ফাকীহ ও জ্ঞানী আর কাউকে পাইনি।[১৫২]

---

[১৫০] ত্বাবকাত আল হানাবিলাহ্, ১/৩১ পৃঃ।

[১৫১] ত্বাবকাত আল হানাবিলাহ্, ১/৯ পৃঃ।

[১৫২] তারিখে বাগদাদ, ৪/৪১৯ পৃঃ, মানাকিব বাইহাকী, ১/৫২৯ পৃঃ।

ইমাম আহ্মাদ (রহ.)-এর ইন্তেকাল : জন্মের পরই মৃত্যুর পর্ব, আল্লাহ তা'আলার এ নিয়মের ব্যতিক্রম মহামানব মুহাম্মদ ﷺ-এর ক্ষেত্রেও ঘটেনি, ঠিক একই নিয়মের শিকার হলেন আহ্লুস্‌সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের ইমম- ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল (রহ.)। ২৪১ হিজরী ১২ রবিউল আউয়াল শুক্রবার সকল মাখলুককে ছেড়ে মহান খালিক এর ত্বরে পাড়িজমান।[১৫৩] আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। আমীন!

ইমম (রহ.)-এর জানাযায় এত বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম হয় যে, ইমাম আব্দুল ওয়াহ্হাব আল ওয়ার্রাক (রহ.) বলেন : জাহেলী যুগে কিংবা ইসলামী যুগে এত বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাবেশ ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই। খোলা মরুভূমিতে প্রথম জানাযা সম্পন্ন হয় যাতে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৬-৮ লক্ষ, কেউ কেউ বলেন দশ লক্ষ, আর নারীর সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। এ ছাড়াও কয়েকদিন পর্যন্ত জানাযা চলতে থাকে।[১৫৪]

জানাযার এ বিড়ল দৃশ্য প্রমাণ করে ইমাম আহ্মাদ সত্যিই সত্যিই আহ্লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের ইমাম।

---

[১৫৩] সিয়ারু আলামুন্নুবালা, ১১/৩৩৭ পৃঃ, আলবিদায়াহ, ১০/৭৯১ পৃঃ।
[১৫৪] সিয়ারু আলামুন্নুবালা ১১/৩৩৯ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণে চার ইমামের অবস্থান

প্রচলিত সমাজে মায্হাবপন্থী কিছু মানুষ মাযহাব মানা ফরয করে দিয়ে বলেন : প্রচলিত চার মাযহাব (হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী) মানা ফরয। মাযহাবের আলোকেই ইসলাম পালন করতে হবে। ইসলাম মানার জন্য মাযহাব ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। এমনকি মাযহাব ছাড়া কুরআন-হাদীসও মানা চলবেনা, কুরআন-হাদীসকে যদি মাযহাব সমর্থন দেয়, তাহলে মানা যাবে। সমর্থন না দিলে মানা যাবে না। অর্থাৎ মাযহাবের আলোকেই কুরআন-হাদীস গ্রহণ করতে হবে, কুরআন-হাদীসের আলোকে মাযহাব নয়। এজন্যই মাযহাবপন্থী ভাইদের কুরআন-হাদীসের কথা স্মরণ করে দিলে উত্তরে বলেন যে, এই নিয়ম বা 'আমাল আমাদের মাযহাবে নেই।

এখন প্রশ্ন হলো এরূপ বুলি ও স্লোগান কি মাযহাবের ইমামদের শিখানো? না ইমামদেরকে এড়িয়ে উপেক্ষা করে মাযহাবের নামে বাড়াবাড়ি ও মিথ্যাচার? একটু চোখ খুলে দেখি মহামতি ইমামগণ কি এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন, না তাঁদের নামে এসব অপপ্রচার? যাঁরা স্বীয় যুগে ও স্বস্থানে ইসলামের কর্ণধার ছিলেন, তাঁরা কি কুরআন-সুন্নাহকে ছেড়ে দিয়ে তাঁদের মত ও পথকে আঁকড়ে ধরার কথা বলতে পারেন? না কখনও হতে পারে না। আসুন চেপে রাখা ইতিহাস খুলে দেখি।

সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর অবস্থান

ইমাম চথুষ্টয়ের প্রথম হলেন ইমাম আবূ হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ) (রহ.)। সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর অবস্থান সম্পর্কে তাঁর শিষ্যগণ তাঁর একাধিক বক্তব্য বর্ণনা করেন, সকল বক্তব্যের মূল কথা হল ইমামদের সুন্নাহ পরিপন্থী মতামতের তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) বর্জন করে সহীহ হাদীস বা সুন্নাহ গ্রহণ করা অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে ইমাম সাহেবের কয়েকটি মূল্যবান বক্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন :

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ

"কোন বিষয়ে যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে, জেনে রেখ সেটাই (সহীহ হাদীসই) আমার মাযহাব বা মত ও পথ"।[১৫৫]

ইমাম সাহেবের এ বক্তব্য সহীহ সনদে প্রমাণিত, তাঁর এ বক্তব্য তাঁর সততা, জ্ঞানের সচ্ছতা এবং আল্লাহভীরুতার এক জলন্ত প্রমাণ। এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজেও সহীহ হাদীস পরিপন্থী কোন কথা ও কাজে অটল থাকতে চাননি এবং কোন অনুসারীকে তা পালনে সম্মতিও দেননি। বরং যে যুগে ও যে স্থানে সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে তাহাই ইমামের মত ও পথ বলে ঘোষণা দিয়ে সহীহ হাদীস বিরোধী কথা ও কাজ বর্জনের নির্দেশ জারি করেন।

তাঁর একথায় প্রমাণিত হয় যে, সত্যিই তিনি হক্ব ইমাম ছিলেন এবং জীবনে ও মরণে সর্বদায় হক্ব গ্রহণ করেছেন। তাই প্রচলিত মাযহাবের সহীহ হাদীস বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য কখনও ইমাম সাহেবকে দোষারূপ করা সমিচিন হবে না। বরং ইমাম সাহেবের এ হক্ব বক্তব্য গ্রহণ না করে প্রচলিত মাযহাবের সহীহ হাদীস বিরোধী কথা ও কাজ ইমাম সাহেবের নামে প্রচার করে তা পালনীয় অপরিহার্য ফাতুয়া দিয়ে মাযহাবপন্থী আলিমরাই ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) উপর যুলম করেছেন। ইমাম সাহেব সহীহ হাদীস বিরোধী কর্মকাণ্ড হতে মুক্ত হতে চাইলেও গোঁড়া

---

[১৫৫] ইবনু আ'বিদীন- আল বাহর আর রায়িক এর হাশিয়ায়-১/৩৬ পৃঃ, এবং রাসমুল মুফতী-১/৪ পৃঃ। শাইখ সালিহ আল ফুল্লানী- ইকাযুল হিমাম-৬২ পৃঃ।

মাযহাবপন্থীরা তাঁকে মুক্ত হতে দিতে চায় না। আল্লাহ্ ইমাম সাহেবকে যেরূপ হেদায়াত দিয়েছেন, মাযহাবপন্থীদেরও সেরূপ হেদায়াত দান করুন। আমীন!

ইমাম সাহেব যেহেতু রাসূল ﷺ হতে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের কাছে দীর্ঘদিন হাদীস শিক্ষার সুযোগ পান নি এবং সে যুগে প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলিও সংকলণ হয়নি। তাই ইমাম সাহেবের এরূপ বক্তব্য সঠিক ও বাস্তব হওয়াই যুক্তি যুক্ত, কারণ হলো : তিনি রাসূল ﷺ হতে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের কাছে দীর্ঘদিন হাদীস শিক্ষার সুযোগ পাননি। দ্বিতীয় কারণ হলো তাঁর যুগে প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলিও সংকলিত হয়নি, যেমন সহীহ্ বুখারীর সংকলক ইমাম বুখারী (রহ.) জন্ম লাভ করেন ১৯৪ হিঃ। সহীহ্ মুসলিমের সংকলক ইমাম মুসলিম (রহ.) জন্ম লাভ করেন ২০৩ হিঃ, এমনিভাবে ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ (রাহিমাহুমুল্লাহ) ইত্যাদি সকলেই ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মৃত্যুর ৪৪ বছর ও তারও পরে জন্ম গ্রহণ করেন, অত:পর তারা তাদের হাদীস গ্রন্থসমূহ সংকলণ করেন। তাই ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর শুভকামনা এই যে, এমন একদিন আসবে যেদিন হাদীস সংকলণ হবে, যঈফ (দূর্বল) হাদীস হতে সহীহ্ হাদীস চিহ্নিত হয়ে যাবে, তখন আর দূর্বল হাদীসের সমাদর থাকবেনা। সহীহ্ হাদীস উপস্থিত হলে ঈমানী দাবী হিসাবে শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীসকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। এ চিন্তা চেতনার আলোকেই তাঁর অমীয় বাণী "কোন বিষয়ে যখন সহীহ্ হাদীস পাওয়া যাবে, জেনে রেখ সেটাই (সহীহ্ হাদীসই) আমার মাযহাব বা মত ও পথ।"

২। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন :

"لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ" وفي رواية : حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيْلِيْ أَنْ يُفْتِيَ بِكَلاَمِي" وزاد في رواية : "فَإِنَّنَا بَشَرٌ، نَقُوْلُ وَالْقَوْلَ الْيَوْمَ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا" وفي أخري : "ويحك يا يعقوب ! (هو أبو يوسف) لاَ تَكْتُبْ كَلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّيْ، فَإِنِّيْ قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَتْرُكُهُ غَدًا، وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ"

"আমরা আমাদের কথাগুলি কোন্ দলীল হতে গ্রহণ করেছি ইহা অবগত হওয়া ছাড়া আমাদের কথা বা ফাতাওয়া গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়"[১৫৬]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : "যে ব্যক্তি আমার দলীল অবগত নয়, তার পক্ষে আমার কথা অনুযায়ী ফতুয়া দেয়া সম্পূর্ণ হারাম।" এর সাথে অন্য বর্ণনায় বর্ধিত অংশ হল : "আমরা সাধারণ মানুষ আজকে এক ফাতাওয়া দেই, আবার আমীকাল তা প্রত্যাহার করে থাকি।"

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : তিনি স্বীয় শিষ্য ইয়াকূব ইমাম আবূ ইউসুফ কে বলেন : "সাবধান তুমি আমার কাছে যা কিছুই শুন, সবই লিখ না, কারণ আমি আজ এক সিদ্ধান্ত নেই, আবার আগামীকাল তা প্রত্যাখ্যান করি। আবার আগামীকাল এক ফাতাওয়া বা সিদ্ধান্ত নেই, তার পরের দিন তা প্রত্যাখ্যান করি।"[১৫৭]

আলোচ্য বক্তব্য হতে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম সাহেব দলীল ভিত্তিক ফাতওয়া প্রদানে সচেষ্ট ছিলেন। প্রয়োজনের তাগীদে কোন বিষয়ে কিয়াসের আলোকে ফাতওয়া দিলেও দলীল বিহীন ও কিয়াস ভিত্তিক ফাতওয়া অনুযায়ী অন্যকে ফাতওয়া প্রদানের অনুমতি দেন নি, বরং হারাম করে দিয়েছেন। এসব প্রমাণ করে যে, প্রচলিত হানাফী মাযহাবের সহীহ হাদীস পরিপন্থী ইমামের নামে ফাতওয়া সমূহ প্রচার প্রসার করা না জায়েয ও হারাম। কারণ এ সমস্ত সহীহ হাদীস বিরোধী মাসায়েল প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয় এবং ইমাম সাহেবের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধার সুযোগ করে দেয়া হয়, অথচ ইমাম সাহেব (র:) এক্ষেত্রে কতইনা সতর্ক ও সচেতন।

ইমাম আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (র:) কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন: "ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর যে সমস্ত কথা সহীহ হাদীস বিরোধী পাওয়া যায় সেগুলোর ক্ষেত্রে যদি ইমামের এরূপই অবস্থান

---

[১৫৬] ইবনু আব্দিল বার আল ইনতিকা-(الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء) গ্রন্থে ১৪৫ পৃ:, ই'লামুল মুয়া'ক্কিঈন- ২/৩০৯ পৃ: ; ইবনু আবিদিন আল বাহর আল রয়িক এর হাশিয়ায়-৬/২৯৩ পৃ: আশ্‌শারানী- আল মিযান- ১/৫৫ পৃ: । শায়খ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম- ৫২ পৃ: ইমাম যুফার হতে সহীহ সনদে প্রমাণিত।

[১৫৭] শায়খ আলবানী (রহ.) সিফাতু সালাতিন্নবী ﷺ - ৪৭ পৃ:

হয়, অর্থাৎ তিনি সহীহ দাহীস পেয়েও ইচ্ছাকৃত ভাবে এরূপ ফাতাওয়া প্রদান করেননি, বরং না পাওয়া অবস্থায় এরূপ ফাতওয়া প্রদান করেছেন। এটা অবশ্যই ইমাম সাহেবের গ্রহণযোগ্য ওজর। কারণ আল্লাহ তা'আলা সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেননি। সুতরাং ইমাম সাহেবকে দোষারূপ করা কখনও জায়েয হবে না। বরং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভাল আচরণ প্রদর্শন করতে হবে, কেননা তিনি মুসলমানদের ঐসব ইমামদের অন্যতম যারা দ্বীনের জন্য অবদান রেখেছেন। বরং অপরাধ ও অবৈধ কর্মে লিপ্ত হয়েছে তারা যারা ইমামের সহীহ হাদীস বিরোধী কথাগুলো কোঠর ভাবে আঁকড়ে ধরে অথচ এগুলো ইমামের মাযহাব নয়। কারণ সহীহ হাদীসই হল তাঁর মাযহাব। অতএব ইমাম সাহেব হলেন এক প্রান্তে, আর ঐসব অনুসারীরা হল আরেক প্রান্তে।"[১৫৮]

৩। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন :

"إِذَا قُلْتُ قَوْلاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى وَخَبَرَ الرَّسُوْلِ ﷺ فَاتْرُكُوْا قَوْلِي"

"আমি যদি এমন কথা বলি যা আল্লাহ তা'আলার কিতাব- কুরআন এবং রাসূল ﷺ এর হাদীসের বিপরীত বা পরিপন্থী হয়, তখন আমার কথাকে বর্জন কর (কুরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধর)।"[১৫৯]

যিনি ইমামুল মুসলিমিন তিনি কিভাবেই বা বলতে পারেন যে, কুরআন ও হাদীস ছেড়ে আমার কথাকেই আঁকড়ে ধর। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অগ্রে কোন কিছু প্রাধান্য দিও না, আর আল্লাহকে ভয় কর।"[১৬০]

অতএব আল্লাহ ভীরু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) অবশ্যই বলবেন যে, কুরআন ও হাদীস গ্রহণ কর এবং আমার কথা বর্জন কর। কিন্তু দুঃখের

---

[১৫৮] শায়খ আলবানী (রহ.) সিফাতু সালাতিন নাবী- ৪৭,৪৮ পৃঃ।
[১৫৯] শায়খ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম-৫০ পৃঃ।
[১৬০] সূরা আল হুজরাত- আয়াত ১।

বিষয় হল তথা কথিত হানাফী মাযহাব অনুসারী ভাইয়েরা ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) দুহাই দিয়ে সহীহ হাদীস বিরোধী ফাত্ওয়া আঁকড়ে ধরতে বদ্ধপরিকর। আল্লাহ আমাদের সকল গোঁড়ামী বর্জন করে কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দান করুন! কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুসারী না হয়ে ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) নির্দেশ ও উপদেশ অনুযায়ী কুরআন ও সহীহ হাদীস আঁকড়ে ধরার তাওফীক দান করুন! আমীন!

৪। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন :

"وَأَصْحَابُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ مُجْمِعُوْنَ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ أَنَّ ضَعِيْفَ الْحَدِيْثِ عِنْدَهُ أَوْلَى مِنَ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ"

"ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর সকল অনুসারীরা একমত যে, ইমাম আবূ হানীফার মত হল: যঈফ (দূর্বল) হাদীস তাঁর কাছে কিয়াস ও অভিমতের চেয়েও অনেক উত্তম।"[১৬১]

কিয়াস ও অভিমতের চেয়ে যদি যঈফ হাদীস উত্তম ও প্রাধান্য যোগ্য হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে কিয়াস ও অভিমতের বিপরীত সহীহ হাদীস পেলে তা মানা অপরিহার্য ফরয। এবং সহীহ হাদীস পেলে কিয়াস ও অভিমত বর্জন করাও ফরয।

৫। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন :

"إِيَّاكُمْ وَالْقَوْلَ فِيْ دِيْنِ اللهِ بِالرَّأْيِ، وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ"

"সাবধান! তোমরা আল্লাহর দ্বীনে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করা হতে বিরত থাক। সকল অবস্থাতেই সুন্নাহর অনুসরণ কর। যে ব্যক্তি সুন্নাহ হতে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।"[১৬২]

ইমাম সাহেবের এ বক্তব্য মানুষের হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে। অর্থাৎ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে থাকাই হল হিদায়াত।

---

[১৬১] ইবনুল কাইয়্যিম- ই'লামুল মুয়াক্কিঈন- ১/৮২ পৃ:।
[১৬২] শা'রানী- মীযানে কুবরা-১/৯ পৃ:।

আর সুন্নাহ বর্জন করে কোন ব্যক্তি, দল, তারীকা ও মাযহাবের অনুসরণ করাই হল পথভ্রষ্টতা। ইমাম সাহেবের এ বক্তব্যের পরও কিভাবে তাঁর দুহাই দিয়ে সহীহ হাদীসকে বর্জন করে মাযহাবী গোঁড়ামির আশ্রয় নিয়ে থাকে? আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দান করুন এবং সকল মত ও পথ বর্জন করে শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণের তাওফীক দান করুন! আমীন!

সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম মালিক (রহ.) এর অবস্থান :

ইমামু দারিল হিজরাহ- মদীনার ইমাম মালিক বিন আনাস (৯৩-১৮৭ হি:) (রহ.)। হাদীসের জগতে প্রথমের দিকে উল্লেখযোগ্য সংকলণ "মুয়াত্তা" গ্রন্থের সংকলক ইমাম মালিক (রহ.)। সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম মালিক (রহ.) এর অবস্থান এত দৃঢ় যে তিনি সুন্নাহর সংকলক, শিক্ষক এবং সুন্নাহর আহবায়ক। তিনিও অন্ধ অনুসরণের কোঠর প্রতিবাদ করেছেন এবং কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ অপরিহার্য করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইমামের কিছু মূল্যবান বক্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হল।

১। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন :

"إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيْبُ، فَانْظُرُوْا فِيْ رَأْيِي، فَكُــلُّ مَــا وَافَــقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوْهُ، وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوْهُ"

"আমি একজন মানুষ মাত্র। চিন্তা গবেষণায় ভুলও হয় আবার সঠিকও হয়। সুতরাং তোমরা আমার অভিমত পরীক্ষা করে দেখ, আমার যে অভিমত কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূলে পাও তা গ্রহণ কর। আর যে অভিমত কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূলে নেই তা প্রত্যাখ্যান কর।"[১৬৩]

ইমাম সাহেবের এ বক্তব্যে প্রমাণিত হয় যে, পালনীয় বিষয় হলো একমাত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস, কোন ব্যক্তির মত, পথ, মাযহাব ও তরীকাহ নয়। কারো ফাত্ওয়া যদি কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী হয় তাহলে গ্রহণ যোগ্য হবে, তিনি যেই হন এবং যে মাযহাবেরই হন না কেন। আর যদি কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী না হয় তাহলে তিনি

---

[১৬৩] ইবনু আব্দিল বার- আল জামি'- ২/৩২ পৃ:, ইমাম ইবনু হাযাম- উসুলুল আহকাম- ৬/১৪৯ পৃ:, ফুলানী ইকাযুল হিমাম- ৭২ পৃ:।

যত বড়ই ইমাম ও মুজতাহিদ হন না কেন তার ফাত্ওয়া প্রত্যাখ্যান যোগ্য। ইহা শুধু ইমাম মালিক (রহ.) এর কথা নয় বরং ইমামে আযম, সাইয়্যেদুল মুরসালীন রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ এর অমীয় বাণী, তিনি বলেন :

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি ইসলামে এমন নতুন কিছুর আগমণ ঘাটাবে যা ইসলামে (কুরআন ও সহীহ হাদীসে) ছিল না তা প্রত্যাখ্যান যোগ্য।"[১৬৪]

২। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন :

لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِلاَّ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلاَّ النَّبِيِّ ﷺ

"সকল ব্যক্তির কথা হয় গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয়, শুধু নাবী ﷺ এর সকল কথাই গ্রহনীয়, কোন বর্জনীয় নয়।"[১৬৫]

অর্থাৎ শুধুমাত্র নাবী ﷺ এর সকল দীনী কথা ওয়াহী ভিত্তিক হওয়ায় গ্রহণযোগ্য, আর সাহাবী, তাবেঈ, ও কোন ইমাম বা আলিম সমাজের কথা যদি কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী হয় তাহলে গ্রহণযোগ্য, আর যদি কুরআন ও সহীহ হাদীস বিরোধী হয় তাহলে অবশ্যই বর্জনীয়। সুতরাং কোন ইমাম বা আলিমের কথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে যাচাই ছাড়াই অন্ধ অনুকরণ করা সংগত কাজ নয়।

৩। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন :

قال ابن وهب : سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال : ليس ذلك على الناس. قال : فتركته حتى خف الناس، فقلت له : عندنا في ذلك سنة، فقال : وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، فقال : إن هذا الحديث حسن، وما سمعته قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل، فيأمر بتخليل الأصابع.

---

[১৬৪] সহীহুল বুখারী হাঃ নং ২৬৯৭, সহীহ মুসলিম হাঃ নং-৪৪৬৭।

[১৬৫] ইবনু আব্দিল বার- আল জামি' - ২/৯১পৃঃ, ইবনু হাযাম- উসূলুল আহকাম- ৬/১৪৫,১৭৯ পৃঃ।

"ইবনু ওয়াহাব হতে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি শুনেছি ইমাম মালিক (রহ.) কে জিজ্ঞাসা করা হল ওযুর সময় পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা সম্পর্কে? তিনি উত্তরে বললেন: ওযূর মধ্যে এমন কোন নিয়ম নেই। ইবনু ওয়াহাব বলেন : আমি একটু অপেক্ষা করলাম মানুষ চলেগেলে ইমাম সাহেবকে বললাম : পায়ের আঙ্গুল খেলাল করার ব্যাপারে আমাদের কাছে হাদীস রয়েছে। ইমাম বললেন : তা কি? আমি বললাম : লাইছ বিন সা'দ ...... মুসতাওরিদ বিন শাদ্দাদ আল কুরাশী বলেন : "আমি রাসূল ﷺ কে হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে পায়ের আঙ্গুলের মাঝে খেলাল করতে বা ভাল ভাবে ডলতে দেখেছি।"

ইমাম (রহ.) বলেন : এ হাদীসটি হাসান, তবে আমি এখন ছাড়া এর পূর্বে কখনও এ হাদীস শুনিনি। ইবনু ওয়াহাব বলেন : এর পরবর্তীকালে ইমাম সাহেবকে ঐপ্রশ্ন করা হলে তিনি উক্ত হাদীসের আলোকে আঙ্গুল খেলাল করার নির্দেশ দিতেন।"[১৬৬]

উল্লেখ্য যে, ইমাম মালিক (রহ.) এর ফাত্ওয়া হাদীস বিরোধী ছিল, কিন্তু তখন তিনি ঐ হাদীসটি জানতেন না। যখনই হাদীস জানলেন এবং তা হাসান বা সহীহ নিশ্চিত হলেন সাথে সাথে নিজের পূর্ব অভিমত বর্জন করে হাদীস অনুযায়ী ফাত্ওয়া প্রদান শুরু করলেন। সহীহ হাদীস পাওয়ার পর নিজের মতের উপর কোন গোঁড়ামি প্রকাশ করলেন না। এরূপই হবে আল্লাহভীরু ও তাঁর রাসূলের ﷺ অনুসারীর অবস্থান, তারা কখনও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ মতের উপর কোন ব্যক্তি এমনকি নিজের মতকেও প্রাধন্য দিতে পারে না। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ মতের উপর নিজের বা কোন ব্যাক্তি ও দলের মতকে প্রধান্য দিবে তারা আসলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ প্রতি পূর্ণ ঈমানদার ও আনুগত্যশীল হতে পারে না।

৪। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন :

مَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ خَانَ الرِّسَالَةَ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ :

---

[১৬৬] ইবনু আবি হাতিম- মুকদ্দামাতুল জারহ ওয়াত তা'দীল- ৩১,৩২ পৃ:, ইমাম বাইহাকী- সুনান- ১/৮১ পৃ:।

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.........﴾

"যে ব্যক্তি কোন বিদআত চালু করে এবং মনে করে ইহা ভাল কাজ, সে যেন দাবী করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ রিসালাতের খিয়ানাত করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। কেননা আল্লাহ তা'আলা রাসূলের জীবদ্দশায় বলেন : "আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ন করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করে নিলাম।" [মায়িদা-৩]

রাসূলের জীবদ্দশায় যা দ্বীন বলে গন্য হয়নি আজও তা দ্বীন বলে গণ্য হবে না।"[১৬৭]

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে পূর্ণতা রূপদান করেছেন এবং তিনি ﷺ তাঁর পূণ ইসলামের রিসালাত সঠিক ভাবে প্রচার করেছেন এর পরও যদি কেউ নতুন ইবাদাত আবিস্কার করে যা রাসূল ﷺ এর যুগে ছিলনা এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের এ ইবাদাত রাসূল ﷺ প্রচার করেন নি। তাই তিনি রিসালাতের খিয়ানত করেছেন, (নাউযুবিল্লাহ)। ইমাম সাহেব এ বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চান যে, ইসলামের সব কিছু রাসূল ﷺ এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অতএব একমাত্র তাঁর অনুসরণ করেই ইসলাম পালন করতে হবে। অন্য কোন ইমাম, দরবেশ, পীর বা মাযহাব ও তরীকা নয়। আল্লাহ আমাদের এ তাওফীক দান করুন, আমীন!

---

[১৬৭] ইমাম শাতবী- ই'তিসাম- ১/৩৩ পৃঃ, "মানহাজ ইমাম মালিক ফি ইছবাতিল আকীদাহ"- ৯৯ পৃঃ।

সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর অবস্থান

উসূল শাস্ত্রের প্রবর্তক ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্‌রীস আশ্‌শাফেয়ী (১৫০-২০৪ হিঃ) রহ.। সুন্নাহকে সচ্ছ ও নিস্কলুষ রাখার নীতিমালা (মুস্‌ত্বালাহুল হাদীস) এর আবিস্কারক এবং অসূলুত তাফসীর ও উসূলুল ফিকহ্ এর রূপকার, ভাষাবীদ ইমাম শাফেয়ী (রহ.) একই ভাবে অন্ধ অনুস্বরণের দাফন করে ইসলামী জীবনে পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের উপর নির্ভরশীল আদর্শ গড়ার লক্ষ্যে যে সব মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেছেন নমুনা স্বরূপ নিম্নে কিছু প্রদত্ত হল:

১। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন :

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِي

"কোন বিষয়ে যখন সহীহ্ হাদীস পাওয়া যাবে জেনে রেখ সেটাই (সহীহ্ হাদীসই) আমার মাযহাব বা মত ও পথ।"[১৬৮]

২। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন :

إِذَا وَجَدْتُمْ فِيْ كِتَابِي خِلاَفَ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقُوْلُوْا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَدَعُوْا مَا قُلْتُ، وفِي رِوايَة: فَاتَّبِعُوْهَا، وَلاَ تَلْتَفِتُوْا إِلَى قَوْلِ أَحَد.

"যখন তোমরা আমার কোন কিতাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহর বিপরীত কিছু পাবে তখন রাসূলুল্লাহর ﷺ সুন্নাহ অনুযায়ী ফাত্ওয়া দাও এবং আমার কথা প্রত্যাখ্যান কর। অন্য বর্ণনায় রয়েছে : তোমরা রাসূলের ﷺ সুন্নাহ অনুসরণ কর, অন্য কারো কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ কর না।"[১৬৯]

নিশ্চয়ই যার আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাতের প্রতি পূর্ণ ঈমান রয়েছে এবং রাসূলের ﷺ প্রতি রয়েছে পূর্ণ শ্রদ্ধা ও অনুসরণ, তিনিই কেবল

---

[১৬৮] ইমাম আননাওয়াবী- আল মাজমু'-১/৬৩ পৃঃ, আশশা'রানী- আলমীযান ১/৫৭ পৃঃ, শায়খ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম- ১০৭ পৃঃ।

[১৬৯] ইমাম আননাওয়াবী আল মাজমু'-১/৬৩ পৃঃ, আল হারাবী- যাম্মুল কালাম-১/৪৭ পৃঃ, আল খাতীব- ইহতিজাজ বিশশাফেয়ী-২/৮ পৃঃ, শায়খ আল ফুলানী- ১০০পৃঃ, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিল- ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন-২/৩৬১ পৃঃ।

এরূপ ঘোষণা দিতে পারেন। এরূপ ঘোষণার পরও যদি কেউ সুন্নাহ বর্জন করে ইমামদের অন্ধ অনুসরণ করে থাকে নিশ্চয়ই এটা এক অহমিকা এবং ইমামদের প্রতি যুলমপূর্ণ আচরণ ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিদায়াত দান করুন, আমীন!

৩। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম আহমাদকে (রহ.) বলেন :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِالْحَدِيْثِ وَالرِّجَالِ مِنِّي، فَإِذَا كَانَ الْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ فَأَعْلِمُوْنِيْ بِهِ أَيَّ شَيْءٍ يَكُوْنُ كُوْفِيًّا أَوْ بَصْرِيًّا أَوْ شَامِيًّا، حَتَّى أَذْهَبَ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ صَحِيْحًا.

"আপনারা আমার চেয়ে হাদীস এবং সনদ সম্পর্কে বেশী অবগত রয়েছেন, অতএব কোন সহীহ হাদীসের সন্ধান পেলে আমাকে জানাবেন কুফী, বাসরী ও শামী যেই হোক না কেন সহীহ হাদীসের জন্য আমি তার কাছে যেতে প্রস্তুত।"[১৭০]

কুফী, বাসরী ও শামী- যে স্থান এবং যে গোষ্টিরেই হোকনা কেন? তা লক্ষনীয় নয়, লক্ষনীয় হলো হাদীস সহীহ কি না? সহীহ হলে অপর দল, গোত্র ও দেশ থেকে হলেও তা গ্রহণ করতে হবে। আর সহীহ না হলে নিজের মত ও দলের হলেও পরিত্যাজ্য কখনও গ্রহনীয় নয়। এ নীতিই হলো ইমামুস সুন্নাহ ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর সুন্নাহ অনুসরণে সঠিক ও দৃঢ় অবস্থান। এরূপই হওয়া উচিত সকল আল্লাহভীরু মুসলিমের অবস্থান। আল্লাহ তাওফীক দান করুন। আমীন!

৪। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন :

كُلُّ مَسْأَلَةٍ صَحَّ فِيهَا الْخَبَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ بِخِلَافِ مَاقُلْتُ، فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهَا فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَوْتِي.

---

[১৭০] ইবনু আবি হাতিম-আদাবুশ্‌শাফেয়ী-৯৪,৯৫ পৃঃ, আবূ নাঈম- আল হুলিয়াহ-৯/১০৬ পৃঃ, আল খাতীব-আল্ ইহতিজাজ ১/৮ পৃঃ, ইবনু আব্দিল বার- আল ইনতিকা-৭৫ পৃঃ, আল আলবানী সিফাতু সালাতিন্নাবী-৫১ পৃঃ।

" আমার জীবদ্দশায় অথবা মৃত্যুর পরে যে সমস্ত মাসআলায় আমার ফাতওয়ার বিপরীত মুহাদ্দিসগণের নিকট সহীহ হাদীস প্রমানিত হয়েছে ঐসব মাসআলায় আমার মত প্রত্যাহার করে (হাদীস গ্রহণ করে) নিলাম।"[১৭১]

মহামতি ইমামদের এরূপ স্পষ্ট ঘোষণার পরও নির্বোধ ব্যক্তি ছাড়া কেও তাঁদের হাদীস বিরোধী ফাতওয়ার অন্ধঅনুসরণ করতে পারে না।

৫। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন :

كُلُّ مَا قُلْتُ فَكَانَ عَنِ النَّبِي ﷺ خِلَافَ قَوْلِيْ مِمَّا يَصِحُّ، فَحَدِيْثُ النَّبِي ﷺ أَوْلَى فَلاَ تُقَلِّدُوْنِي.

"আমি যে সব ফাতওয়া দিয়েছি এর বিপরীত নাবী ﷺ হতে সহীহ হাদীস প্রমাণিত হলে নাবী ﷺএর হাদীসই গ্রহণযোগ্য ও প্রাধান্য পাবে, অতএব আমার কোন অন্ধানুকরণ কর না।"[১৭২]

ইহা ছাড়াও ইমাম শাফেয়ীর (রহ.) আরো অনেক মূল্যবান উপদেশ রয়েছে, বরং ইমাম শাফেয়ীর (রহ.) এরূপ বক্তব্যই সবচেয়ে বেশী ও স্পষ্ট। ইহা প্রমাণ করে যে, তাঁর কোন ফাতওয়া সহীহ হাদীস বিরোধী হলে তা অবশ্যই তাঁর অজানাবস্থায়। এর পরেও সে ফাতওয়ার কেউ যেন অন্ধানুসরণ কারী না হয় এ জন্য সে সমস্ত ফাতওয়া হতে অগ্রীম তাঁর মত প্রত্যাহার করেছেন এবং অন্ধানুসরনের তিব্র প্রতিবাদ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্ণ জাযায়ে খাইর দান করুন এবং আমাদের সঠিক হিদায়াত দান করুন। আমীন!

---

[১৭১] ইবনু আবি হাতিম- আদাবুশশাফেয়ী-৯৩ পৃঃ, আবূ নাঈম- আল হুলিয়্যাহ-৯/১০৬ পৃঃ, আল-আলবানী- সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ-৫২পৃঃ।

[১৭২] ইবনু আবি হাতিম- আদাবুশ শাফেয়ী-৯৩ পৃঃ, আবূ নাঈম- ইত্যাদি, আল-আলবানী- সিফাতুসালাতিন্নাবী-৫২পৃঃ।

সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম আহমাদ (রহ.) এর অবস্থান

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্যতম ইমাম, সর্ববৃহত ও উল্লেখ যোগ্য হাদীসের গ্রন্থ "মুসনাদ ইমাম আহমাদ" এর সংকলক ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বাল (১৬৪-২৪১ হিঃ) রহঃ। তিনি চার ইমামের মধ্যে হাদীস শাস্ত্রে সবচেয়ে বেশী অবদান রেখেছেন। আব্বাসীয় যুগে মুতাযিলাদের খাল্‌কে কুরআন ফিতনার সম্মুখীন হয়ে সর্বশেষে তিনি একায় জেল-যুলুম সহ্য করে হকের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম সাহেবের কিছু মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করা হল।

১। ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন :

لاَ تُقَلِّدْنِيْ وَلاَ تُقَلِّدْ مَالِكًا وَلاَ الشَّافِعِيَّ وَلاَ الْأَوْزَاعِيَّ وَلاَ الثَّـــورِيَ، وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا.

"তুমি আমার অন্ধ অনুসরণ কর না এবং ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আওযাঈ ও ছাওরী প্রমুখের অন্ধ অনুসরণ কর না, বরং তাঁরা যেখান হতে গ্রহণ করেছেন তুমিও সেখান হতে গ্রহণ কর।"[১৭৩]

মানুষ অনুসরণ করবে কুরআন এবং সুন্নাহর, কোন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা নয়। তিনি যতবড়ই বিদ্যান, দার্শনিক ও ইমাম হোন না কেন? এ বিষয়টিই তুলে ধরেছেন ইমাম আহমাদ (রহ.)। তিনি কোন পক্ষ পাতিত্বও করেননি বরং সর্বপ্রথম নিজেকে দিয়েই শুরু করেছেন। নিষেধ করলেন তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণের এবং নিদের্শ দিলেন কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের। ইমামগণ যেখান হতে দ্বীন গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ কুরআন ও সহীহ হাদীস হতে তোমরাও সেই কুরআন ও সহীহ হাদীস হতে গ্রহণ কর কোন ইমামের চিন্তা প্রসুত ফাতওয়া হতে নয়।

অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন:

لاَ تُقَلِّدْ دِيْنَكَ أَحَدًا مِنْ هَؤُلاَءِ، مَا جَاءَ عَنِ النَّبِي ﷺ وَأَصْحَابِه فَخُذْ بِـــهِ، ثُمَّ التَّابِعِيْنَ بَعْدَ الرَّجُلُ فِيْهِ مُخَيَّرٌ، وَقَالَ مَرَّةً: الاِتِّبَاعُ أَنْ يَتَّبِعَ الرَّجُلُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ أَصْحَابِه، ثُمَّ هُوَ مِنْ بَعْدِ التَّابِعِيْنَ مُخَيَّرٌ.

---

[১৭৩] ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম- ই'লামুল মু'আক্কিঈন- ২/৩০২ পৃঃ, শায়খ আল-ফুলানী- ইকাযিল হিমাম- ১১৩ পৃঃ, মাজমু' ফাতাওয়া-২০/২১২ পৃঃ।

"তোমার দীনের ব্যাপারে ঐসব ইমামদের কাউকে অন্ধ অনুসরণ কর না, বরং রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের হতে যা এসেছে তা গ্রহণ কর। তাবেঈদের ক্ষেত্রে তুমি স্বাধীন। আবার কখনও বলেন : অনুসরণ শুধুমাত্র রাসূল ﷺ এবং সাহাবীদের হতে যা প্রমাণিত হয়েছে তাহাই। এরপর তাবেঈদের ক্ষেত্রে তুমি স্বাধীন।"[১৭৪] অর্থাৎ তাদের কথা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হলে অনুসরণ করবে আর না হলে করবে না।

২। ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন :

رَأْيُ الْأَوْزَاعِيِّ وَرَأْيُ مَالِكٍ، وَرَأْيُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ كُلُّهُ رَأْيٌ، وَهُوَ عِنْدِيْ سَوَاءٌ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي الْآثَارِ.

"ইমাম আওযাঈ এর অভিমত, ইমাম মালিক এর অভিমত এবং ইমাম আবূ হানীফা এর অভিমত সবই আমার কাছে অভিমত হিসাবে সমান অর্থাৎ একটাও শরীয়তের দলীল হতে পারে না। শরীয়তের দলীল শুধুমাত্র রাসূল ﷺ এবং সাহাবীদের হাদীস থেকেই হবে।"[১৭৫]

৩। ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন :

عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوْا الإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ يَذْهَبُوْنَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ، وَاللهُ يَقُوْلُ :

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"আমি আশ্চর্য হই তাদের আচরণে যারা সহীহ হাদীস জানা সত্ত্বেও ইমাম সুফইয়ানের অভিমত গ্রহণ করতে চায়, অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"অতএব যারা তাঁর আদেশের (রাসূলের হাদীসের) বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা যেন সতর্ক হয় যে, তাদের কে ফিৎনা পেয়ে যাবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাদেরকে গ্রাস করবে। [সূরা নূর-৬৩][১৭৬]

---

[১৭৪] আবূ দাউদ- মাসায়িল ইমাম আহমাদ-২৭৬,২৭৭ পৃঃ, আল আলবানী- সিফাতুসালাতিন্নাবী-৫৩ পৃঃ।

[১৭৫] ইবনু আব্দিল বার- আল জামি'-৩/১৪৯ পৃঃ।

[১৭৬] ইমাম ইবনু বাত্তাহ- আল ইবানাহ কুবরা-১/২৬০ পৃঃ, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ- আল মাজমু'-১৯/৮৩ পৃঃ, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম-ই'লাম-২/২৭১ পৃঃ, তাইসীরুল আযীয আল হামীদ- ৫৪৫ পৃঃ, ফতহুল মাজীদ-৩২২ পৃঃ।

শুধু ইমাম সুফইয়ানের অনুসারীদের অবস্থা এরূপ নয়, বরং ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, শাফিয়ী ও আহমাদ (রাহেমাহুমুল্লাহ) প্রভৃতি সকল ইমামের ও পীর-দরবেশের অনুসারীদের অবস্থা একই। সহীহ্ হাদীস জানা সত্ত্বেও তা বর্জন করে ইমামের মতামতের অন্ধ অনুসরণে অবশ্যই আয়াতে বর্ণিত শাস্তি প্রাপ্য হবে।

৪। ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন :

لاَ تُقَلِّدْ دِيْنَكَ الرِّجَالَ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْلِمُوْا مِنْ أَنْ يَّغْلِطُوْا.

"তুমি তোমার দ্বীনের বিষয়ে (নাবী-রাসূল ছাড়া) কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ কর না, কারণ তারা কক্ষণও ত্রুটি মুক্ত নয়।"[১৭৭]

মানুষের মাঝে ত্রুটি মুক্ত শুধু নাবী-রাসূলগণ, তাই তাঁদের ওয়াহী ভিত্তিক সকল দীনি বিষয় অনুসরণ করা উম্মাতের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু নাবী-রাসূল ছাড়া অন্যরা এমন কি সাহাবারাও মাসূম বা ত্রুটি মুক্ত নয় তাই তাদের তাকলীদ বা অন্ধানুসরণ বৈধ নয়, বরং তাঁদের কথা যদি সহীহ হাদীসের সাথে মিলে যায় তাহলে অনুসরণে কোন বাঁধা নেই। আর হাদীসের সাথে বিরোধ পূর্ণ হলে অবশ্যই বর্জনীয়।

সুন্নাহ অনুসরণে চার ইমামের অবস্থান সম্পর্কে আমরা মহামতি ইমামদের বক্তব্য হতে সরাসরি অবগত হতে পারলাম যে, তাঁরা সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। সেচ্ছায় ও জেনে শুনে কখনও সুন্নাহ্ পরিপন্থী কোন কথা ও কাজ প্রকাশ করেননি। এমনকি অজ্ঞতাবসত কিছু প্রকাশ পেয়ে থাকলে সে জন্য অগ্রীম সতর্ক করে দিয়েছেন, সহীহ হাদীস বর্জন করে তাদের ফাত্ওয়া মানা হারাম করে দিয়েছেন এবং যে যুগে ও যে স্থানে সহীহ্ হাদীস পাওয়া যাবে তা পালন করা অপরিহার্য করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের অবদানকে কবুল করে নিন এবং তাঁদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউসে সুউচ্চ আসন দান করুন। আমীন! আর মাযহাবী ও তরীকাপন্থী অন্ধদের সহীহ্ হাদীস দর্শনের ও পালনের তাওফিক দান করুন। আমীন!

---

[১৭৭] ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ- আল মাজমূ'-২০/২১২ পৃঃ।

পরিশিষ্ট : الخاتمة

ইমামদের ফাত্ওয়া কি সুন্নাহ পরিপন্থী হতে পারে?

প্রসিদ্ধ মহামতি চার ইমাম ৮০ হিঃ হতে ২৪১ হিঃ এর মধ্যে পৃথিবীতে আগমণ করেছেন এবং বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তাঁদের অধিকাংশের সময়টি ছিল এমন যখন প্রসিদ্ধ ছয়টি (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ) হাদীস গ্রন্থ পূর্ণভাবে সংকলিত হয়নি। বিশেষ করে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুমুল্লাহ) এর বিদায় মুহূর্তেও ঐ প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলোর সূচনা হয়নি বরং অনেকেরই জন্ম হয়নি। যার ফলে হাতের নাগালে সকল হাদীস পাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু শিক্ষার্থী ও জনসাধারণের সাওয়াল জিজ্ঞাসা কখনও বন্ধ ছিল না। আপন আপন এলাকার প্রসিদ্ধ আলিম হিসাবে সম্মুখীন হয়েছেন বিভিন্ন রকম জটিল প্রশ্নের। কুরআনসহ যার কাছে যত হাদীস ছিল সে আলোকে জবাব দিয়েছেন, এবং হাদীসের অবর্তমানে প্রয়োজনে ইজতেহাদ-গবেষণা করে জবাব দিয়েছেন, ফলে সুন্নাহ পরিপন্থী কিছু ফাত্ওয়া হওয়াই সাভাবিক, যার জলন্ত প্রমাণ হলো তাঁদের নির্দেশনা ও সতর্কতা মূলক বক্তব্য সমূহ। যেমন ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন : "আমি যদি কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী কোন ফাত্ওয়া প্রদান করি তাহলে আমার ফাত্ওয়া প্রত্যাখ্যান কর।"[১৭৮] ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন : আমি যে সব ফাত্ওয়া প্রদান করেছি এর বিপরীত নাবী ﷺ-এর সহীহ হাদীস প্রমাণিত হলে নাবী ﷺ এর হাদীসই গ্রহণযোগ্য ও প্রাধান্য পাবে, অতএব আমার কোন অন্ধানুকরণ করনা।"[১৭৯] এধরণের সকল ইমামেরই নির্দেশনা। এতে প্রমাণিত হয় ইমামদের কোন কোন ফাত্ওয়া সুন্নাহ পরিপন্থী হতে পারে। তবে তাঁদের সুন্নাহ বিরোধী ফাতাওয়া কখনও

---

[১৭৮] এ গ্রন্থের- ৮৬ পৃঃ দ্রঃ।

[১৭৯] এ গ্রন্থের- ৯৪ পৃঃ দ্রঃ।

ইচ্ছাকৃতভাবে ও স্বজ্ঞানে ছিল না, যেমনটি আজকাল মাযহাব পন্থী ও তরীকাবাদী ভাইদের মধ্যে পাওয়া যায়।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ.) স্বীয় গ্রন্থ "رفع الملام عن الأئمة الأعلام"-এ ইমামগণ সেচ্ছায় সুন্নাহ বিরোধী ফাত্‌ওয়া প্রদান করেননি এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি ইমামদের ফাত্‌ওয়া হাদীস বিরোধী হওয়ার দশটি গ্রহণ যোগ্য কারণ বর্ণনা করেছেন তন্মধ্যে কয়েকটির সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

প্রথম কারণ : ইমামের কাছে হাদীস না পৌছা :

হাদীস না পাওয়ায় চিন্তা-গবেষণা করে ফাত্‌ওয়া প্রদান করেন, ফলে ফাত্‌ওয়া হাদীস পরিপন্থী হয়ে যায়, মুলতঃ ইমাম হাদীস পাওয়া সত্ত্বেও হাদীস পরিপন্থী ফাত্‌ওয়া প্রদান করেননি, যেমনটি বর্তমান মাযহাব পন্থী আলিমগণ করে থাকেন।

ইমামদের এরূপ ত্রুটি হওয়া কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়, কেননা নাবী ﷺ এর একান্ত সাহাবী হওয়ার যারা সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, সকাল-সন্ধা নাবী ﷺ এর কাছে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদেরও সকল হাদীস জানা না থাকায় এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যেমন আবূ বকর (রাঃ), ওমার (রাঃ) ও আলী (রাঃ) সহ অনেক সাহাবী।[১৮০]

দ্বিতীয় কারণ : ইমামের কাছে হাদীস পৌছেছে কিন্তু বিশুদ্ধতায় টিকেনি। অর্থাৎ হাদীস অগ্রহণযোগ্য মনে হওয়ায় ইজতিহাদের আলোকে ফাত্‌ওয়া প্রদান করেছেন। আবার একই হাদীস ভিন্ন জনের কাছে ভিন্ন সনদে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তৃতীয় কারণ : ইমাম হাদীস পেয়েছেন, গ্রহণও করেছেন, কিন্তু পরে তা ভুলেগেছেন, ফলে ইজতিহাদ ভিত্তিক ফাত্‌ওয়া প্রদান করেছেন।

চতুর্থ কারণ : হাদীসের শব্দ ও ভাব দূর্বোদ্ধ হওয়ায় বুঝের ভিন্নতার কারণে ফাত্‌ওয়া ভিন্নরূপ হয়ে যায়।

---

[১৮০] বিস্তারিত দ্রঃ ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ- "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" ৪-১২ পৃঃ।

পঞ্চম কারণ : হাদীসের মাঝে কোন দন্দ পরিলক্ষিত হওয়ায় বা মানসুখ (রহিত) মনে করে ভিন্ন ফাত্ওয়া প্রদান হয়ে থাকে।

সুতরাং উপর্যুক্ত কারণে ইমামদের সুন্নাহ বিরোধী ফাত্ওয়া হওয়ায় তাঁরা মা'যুর নিরপরাধ। এছাড়া আরো বড় দিক হলো তাঁরা তাঁদের ফাতাওয়ার বিপরীত সহীহ হাদীস প্রমাণিত হলে ফাত্ওয়া বর্জন করে হাদীস অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন, অতএব সুন্নাহ অনুসরণে তাঁদের অবস্থান সঠিক ও নির্ভুল। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলকে জাযায়ে খাইর দান করুন, আমীন!

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল মহামতি ইমামদের প্রতি অন্ধ-মুকাল্লিদদের অশোভনিয় আচরণ, তারা ইমামদের অনুসরণের দুহাই দিয়েও তাঁদের নির্দেশনা ও সতর্কবানী মানতে চায় না। অন্ধ অনুসরণে সহীহ হাদীস বর্জনেও তাদের বিবেকে বাঁধে না। আল্লাহ তাদের হেদায়াত দান করুন, আমীন!

ইমামদের ব্যাপারে অতিশ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধা উভয়ই নিষিদ্ধ

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾

"যারা জ্ঞানী আর যারা জ্ঞানী নয় উভয় কি সমান হতে পারে।"

[সূরা যুমার : ৯]

কখনও না! যরা জ্ঞানী তাঁরা অবশ্যই জ্ঞানহীনদের চেয়ে অনেক সম্মানী ও মর্যাদাশীল। বিশেষ করে যারা ঈমান আনার পর জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

"তোমাদের মাঝে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বহু উঁচু করেছেন।" [সূরা মুজাদালাহ : ১১]

এছাড়াও আলিমদের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে অনেক বর্ণনা এসেছে। নাবী ﷺ বলেন :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ.

"তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যারা আমাদের বড়দের সম্মান জানায়না, ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের আলিমদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় না।"[১৮১]

অবশ্য আলিম বলতে সেই আলিম মর্যাদার অধিকারী যিনি হবেন হকপন্থী অর্থাৎ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ নিজে মানবেন এবং অন্যকে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর প্রতি আহবান জানাবেন, যেমন- ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম প্রমুখ হকপন্থী ইমামগণ (রাহিমাহুমুল্লাহ)। যারা নিজের মনগড়া ফাত্ওয়া ও মাযহাবের প্রতি আহবান করেননি, বরং আহবান করেছেন কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার প্রতি। পক্ষান্তরে যারা মনগড়া ও সুন্নাহ পরিপন্থী ফাত্ওয়া, মাযহাব ও তরীকার প্রতি আহবান জানায় এবং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ বাদ দিয়ে তাদের তৈরী করা বিষয়গুলো মানুষকে পালন করতে বাধ্য করে তারা কখনও মর্যাদার অধিকারী নয়।

[১৮১] মুসনাদ আহমাদ- ৫/৩২৩ পৃঃ, সহীহ আল জামি' হাঃ ৫৪৪৩।

মাযহাব ও ত্বরীকার অপপ্রভাব

মহামতি ইমামদেরকে অতিশ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধার পিছনে প্রচলিত মাযহাব ও ত্বরীকা অনেকটা দায়ী। স্বীয় মাযহাবের ইমামের প্রশংসা করতে করতে তাকে ফিরেশতা, নাবী-রাসূল অথবা আল্লাহর পর্যায় পৌঁছে দেয়া হয়। যেমন- ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর চরমপন্থী অনুসারীরা বলেন : "তিনি একাধারে চল্লিশ বছর ঈশার উযূ দিয়ে ফজর পড়েছেন।" একথার প্রতিবাদ করে আল্লামা ফিরোযাবাদী (রহ.) বলেন : ইমাম আবূ হানীফার ব্যাপারে যে সমস্ত ডাহা মিথ্যা কথা ছাড়ানো হয় তন্মধ্যে এটি অন্যতম। কারণ ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মত ব্যক্তির উত্তম পন্থা অবলম্বন করাই স্বাভাবিক, তাহলো প্রতি নামাযের জন্য নতুন নতুন অযূ করা। এছাড়াও একাধারে চল্লিশ বৎসর পূর্ণ রাত্রি জেগে থাকা কোন মানুষের জন্য অসম্ভব বিষয়। সুতরাং এসমস্ত অবান্তর ভ্রান্ত কথা গোঁড়াপন্থী মূর্খদের ছাড়া আর কারো হতে পারে না।"[১৮২]

এ ছাড়াও সাধারণ বিবেকে চিন্তা করলে একজন ইমামের মত ব্যক্তির জন্য ইহা অবশ্যই অশোভনিয়, কেননা কেউ প্রতি রাত জেগে থাকলে তাকে অবশ্যই সারাদিন ঘুমাতে হবে, অথচ আল্লাহ তা'আলা রাত্রি তৈরী করেছেন ঘুমের জন্য, আর দিন দিয়েছেন কর্মের জন্য। রাসূল ﷺ সর্বদায় গোটা রাত্রি জেগে ইবাদাত করতে নিষেধ করেছেন, তিনিও এরূপ করতেন না, বরং কিছু অংশ ইবাদাত করবে আর কিছু অংশ ঘুমাবে এটাই রাসূলের ﷺ সুন্নাত। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) গোটা রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূলের সুন্নাহর বিরুদ্ধ কর্মে লিপ্ত হয়েছেন। তা কিভাবে হতে পারে?

ইমামের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে গিয়ে মর্যাদাহীন করে দিয়েছে। আবার কেউ ফাযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে ইমামদের মাসূম বা ত্রুটি মুক্ত বানিয়ে ফেলে। নিজের মাযহাব ও ত্বরীকাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজের ইমাম বা পীরকে ফেরেস্তা বানায় এবং অন্যের ইমাম পীরকে শয়তান ইবলিশ

---

[১৮২] আল্লামা ফিরোযাবাদী আর রদ্দ আলাল মু'তারিয-১/৪৪ পৃ:, আল্লামা আলবানী সিফাতুসালাতিন্নাবী-১২০ পৃ:।

বানায়। এ সমস্ত বাড়াবাড়ী মাযহাব ও ত্বরীকার গোঁড়ামীর কারণেই। তাই মাযহাব ও ত্বরীকার গোঁড়ামী বর্জন করে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরলে এবং সকল ইমামকে নিজের ইমাম মনে করলে অতিশ্রদ্ধা আর অশ্রদ্ধা থাকবে না, কেউ ভক্তি আর কেউ বিদ্বেষের পাত্র হবে না, সকলেই সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের মাযহাব ও ত্বরীকার অপপ্রভাব হতে রক্ষা করে খাটি মুসলিম ও হকপন্থী ইমামদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন!

মাযহাব মানা ফরয না কুরআন-সুন্নাহ্ মানা ফরয?

মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে নাবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের কাছে অবতীর্ণ করেছেন ওয়াহী (কুরআন ও সুন্নাহ)। এ ওয়াহী ভিত্তিক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ আনুগত্যের নামই হল ইসলাম। এ ইসলাম পালন করাই কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য ফরয।

ইসলাম পালন শুধু নাবী ﷺ এর যুগ বা সাহাবী ও তাবেঈদের যুগের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগে ও স্থানের মানুষের জন্য একমাত্র ইসলাম পালন করা ফরয। এ কথায় কোন মুসলমানের দ্বিমত থাকতে পারে না। দ্বিমত থাকলে সে অবশ্যই মুসলমান নয়। ইসলাম যদি এরূপই হয়। তাহলে কেন রাসূল ﷺ ও সহাবী-তাবেঈদের যুগে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যে ইসলাম মানা হতো তা পাশে সরিয়ে রেখে বিভিন্ন নামে মাযহাব ও ত্বরীকা (হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী- কাদেরীয়া, নখশবন্দিয়া ইত্যাদি) তৈরী করা হল এবং মুসলিম উম্মার জন্য তা ফরয বা ওয়াজিব করে দেয়া হল? মাযহাবী ও ত্বরীকাপন্থী ভাইদের অপপ্রচার আশ্চর্যের পর আশ্চর্য মনে হয়!

রাসূল ﷺ ও সাহাবীদের যুগের ইসলাম কি আজ আচল? অচল না হলে কুরআন ও সুন্নাহর ইসলাম বাদ দিয়ে কেন এসব মাযহাব ও ত্বরীকার আবির্ভাব? এ বিষয়ে কলম ধরলে অনেক দূর পর্যন্ত চলতে থাকবে, তাই কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তরের আবতারণা করেই ইতি টানতে চাই।

প্রশ্ন (১) : আল্লাহ্ তা'আলা কি ওয়াহীর মাধ্যমে মাযহাবী (হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী) ইসলাম দিয়েছেন? না কুরআন-সুন্নাহর ইসলাম দিয়েছেন?

উত্তর : কুরআন সুন্নাহর ইসলাম দিয়েছেন। সকল মুসলিম সমাজ এ বিষয়ে একমত।

প্রশ্ন (২) : রাসূল ﷺ কি কুরআন-সুন্নাহর ইসলামই নিয়ে এসেছেন? না মাযহাবী (হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী) ইসলাম নিয়ে এসেছেন?

উত্তর : রাসূল ﷺ শুধু কুরআন-সুন্নাহর ইসলাম নিয়ে এসেছেন, সকল মুসলিম সমাজ এ বিষয়ে একমত।

প্রশ্ন (৩): আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরআনে এবং রাসূল ﷺ তাঁর সহীহ হাদীসে কি মাযহাবী ইসলাম মানার নির্দেশ দিয়েছেন? না কুরআন-সুন্নাহর ইসলাম মানার নির্দেশ দিয়েছেন?

উত্তর : কুরআন-সুন্নাহর ইসলাম মানার নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে সকল মুসলিম সমাজ একমত।

প্রশ্ন (৪): মহামতি চার ইমাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) কি কুরআন-সুন্নাহর ইসলাম মানার নির্দেশ দিয়েছেন? না তাঁদের নামে রচিত মাযহাব মানার নির্দেশ দিয়েছেন?

উত্তর : মহামতি চার ইমাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) সহীহ সনদে প্রমাণিত তাঁদের বক্তব্যে কুরআন-সুন্নাহর ইসলাম মানার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর বিরোধী তাঁদের ফাত্ওয়া হলেও তা প্রত্যাখ্যাণ করে কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়েও সকল মুসলিম সমাজ একমত, কারণ তাঁদের যুগে পৃথিবীর বুকে এসব মাযহাবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আল্লামা মুহাদ্দিস দেহলবী শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) বলেন : হিজরী চারশত বছরের পর এ মাযহাবী অন্ধ অনুকরণ শুরু হয়।[১৮৩]

---

[১৮৩] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ- ১/৪৬৮ পৃঃ।

প্রশ্ন (৫): আমাদেরকে আখিরাতে হানাফী বা মালেকী বা শাফেয়ী বা হাম্বলী বা নখশাবন্দী বা চিশতী বা কাদেরী ইত্যাদি ছিলাম কিনা? এ প্রশ্ন করা হবে? না কুরআন-সুন্নাহর ইসলাম পালন করেছি কিনা? এ প্রশ্ন করা হবে?

উত্তর : কোন্ মাযহাবে ছিলাম বা না ছিলাম কখনও এ প্রশ্ন করা হবে না, কিন্তু অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে কুরআন-সুন্নাহর ইসলাম পালন করেছি কিনা? এ বিষয়েও সকল মুসলিম সমাজ একমত।

হে মুসলিম ভাই ও বোন! উক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তরে যদি সকল মুসলিম সমাজ একমত হয়ে থাকেন, তাহলে মাযহাব ও ত্বরীকার প্রচার আবার কেন? ইমাম তাহাবী (রহ.) যথার্থই বলেছেন :

لاَيُقَلِّدُ إِلاَّ جَاهِلٌ أَوْ عَصَبِيٌّ

"অন্ধ অনুসরণের পথ হল গোঁড়াপন্থী জাহেল মুর্খের।"[১৮৪]

অতএব আসুন জাহেলী ও মুর্খতা বর্জন করে। বিভ্রান্তির অপপ্রচার ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্ তাঁআলাকে ভয় করি এবং ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ (রহ.) এর প্রতি প্রদ্ধাশীল হয়ে তাঁদের উপদেশের আলোকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসকেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে আকাঁড়ে ধরি। কারণ শুধু কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্-ই মানা ফরয অন্য কিছু নয়। আল্লাহ্ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

---

[১৮৪] তা'লীক শায়খ সালীম আলা হ্বাল মুসলিম মুলযামু.....৫০ পৃঃ।

আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ : কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা

মাযহাব মানা ফরয না কুরআন-সুন্নাহ মানা ফরয? শীর্ষক আলোচনায় ৩য় প্রশ্নের উত্তর ছিল আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হল কুরআন ও সুন্নাহ পালন করা, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾

"(হে মানব সকল!) তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ কর না। তোমরা অতি অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।" [সূরা আরাফ : ৩]

অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ হলো একমাত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে এবং কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী সকল মাযহাব তরীকাহ ও দল-মত বর্জন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অগণিত আয়াতে আলোকপাত করেছেন, যেমন- সূরা বাকারাহ -২১৩, সূরা নিসা ৫৯, সূরা আনআম- ১০৬, সূরা আহযাব- ২, ও সূরা জাছিয়াহ ১৮ ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনে মুমিন ও কাফিরদের অবস্থান

আল্লাহ তা'আলর এ কঠিন নির্দেশের অগ্নী পরীক্ষায় মানব সমাজ হয় পালন করবে, অথবা পালন করবে না। সব দল-মত, চিন্তা-চেতনা, ছল-চাতুরী ও মাযহাব-ত্বরীকাহ বর্জন করে যারা বীর-মুজাহিদের ন্যায় লাব্বাইক বলে সারা দিবে এবং শুনলাম ও সাথে সাথে মেনে নিলাম বলে ঘোষণা দিবে তারাই হবে কাময়াবী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾

"মু'মিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই হবে যখন তাদের মাঝে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে : আমরা শুনলাম ও অনুসরণ করলাম। এরাই সফলকাম। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তাঁরাই কৃতকার্য।"[সূরা নূর : ৫১, ৫২]

অতএব আল্লাহর নির্দেশে মুমিন ব্যক্তির অবস্থান হবে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তথা কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ শুনামাত্রই তা পালনের স্বীকৃতি দিবে এবং তা আঁকড়ে ধরবে। কোন করমের ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিবে না। পক্ষান্তরে যারা মুমিন নয় তাদের জবাবও আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

"যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহর নাযিল কৃত বিধান এবং রসূলের দিকে এস, তখন তারা বলে : আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি, যদিও তাদের বাপ-দাদারা কোন জ্ঞান রাখত না এবং হিদায়াত প্রাপ্ত ও ছিল না।" [সূরা মায়িদাহ : ১০৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ﴾

"যখন তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা সেই সবের অনুসরণ কর যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন, তখন তারা বলে কখনও না বরং আমরা তাই অনুসরণ করব যার উপর আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি। যদিও তাদের বাপ-দাদা কিছুই বুঝত না এবং হেদায়াত প্রাপ্তও ছিল না।" (সূরা বাকারাহ ১৭০)।

আলোচ্য আয়াত দু'টিতে প্রতিয়মান হয় যে, কুরআন ও সুন্নাহর আহ্বানে বাপ দাদার মতবাদ, মাযহাব ও ত্বরীকার কোন দোহাই চলবে না, কারণ শুধু কুরআন ও সুন্নাহ-ই অনুসরণীয়, আর কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী বাপ-দাদার মতবাদ, মাযহাব ও ত্বরীকাহ সবই বর্জণীয়। এরপরও যদি কেউ আঁকড়ে ধরতে চায় তা হবে প্রকাশ্য কাফিরদের অবস্থান। কেননা মুমিনের অবস্থান হলো কুরআন-সুন্নাহ শুনামাত্রই অনুসরণ করা, আর কাফিরদের অবস্থান হল নানা রকম ছল-চাতুরী ও দোহাই দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করা।

হে আল্লাহ তা'আলা! আমাদের সব কিছু বর্জন করে শুধুমাত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করে ইহকাল ও পরকালে সফলকাম হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

গ্রন্থপঞ্জী

১। আল-কুরআনুল কারীম ২। তাফসীর আত তাবারী- ইমাম ইবনু জারীর আত্-ত্বাবারী ৩। তাফসীর ইবনে কাসীর- ইমাম ইবনু কাসীর ৪। তাফসীর কুরতুবী- ইমাম কুরতুবী ৫। তাফসীর রুহুল মা'আনী- ইমাম আলুসী ৬। সহীহুল বুখারী- ইমাম বুখারী ৭। সহীহ্ মুসলিম- ইমাম মুসলিম ৮। সুনান আবূ দাউদ- ইাম আবূ দাউদ ৯। জামি আত্-তিরমিযী- ইমাম তিরমিযী ১০। মুয়াত্তা- ইমাম মালিক ১২। মুসতাদরাক আল হাকিম ১৩। সুনান ইবনে মাজাহ্- ইমাম ইবনে মাজাহ ১৪। সুনান নাসাঈ- ইমাম নাসাঈ ১৫। সুনান দারেমী- ইমাম দারেমী ১৬। সুনান বায়হাকী- ইমাম বায়হাকী ১৭। সহীহ্ আল জামি- শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী ১৮। মুসনাদ আহমাদ- ইমাম আহমাদ ১৯। লিসানুল আরব- ইমাম ইবনু মানযূর ২০। তাজুল আরূস মিন জাওয়াহিরিল কামুস ২১। আল মু'জাম আল ওয়াসীত ২২। خبر الواحد و حجيته- ড. আহমাদ আশশানকিত্বী ২৩। الحديث حجة بنفسة فى العقائد ولأحكام- আল্লামাহ্ শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী ২৪। মাদখালুদ দালায়িল- ইমাম বায়হাকী ২৫। আল কিফায়াহ্- ইমাম আল খাতীব বাগদাদী ২৬। জামি বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী- ইমাম ইবনু আবদিল বার। ২৭। مقمة تحفة الأحوذى- আল্লামাহ্ আবদুর রহমান মুবারকপুরী ২৮। কিতাবুল উম্ম- ইমাম শাফেয়ী ২৯। مكانة السنة فى الاسلام- ড. লুকমান সালাফী ৩০। আস্-সুন্নাহ্- ইমাম মারওয়াযী। ৩১। আল ইহকাম- ইমাম আমিদী ৩২। মুখতাসারুল ফিকহ্ আল ইসলামী- মুহাম্মাদ ইবরাহীম আত্-তুয়াইযিরী ৩৩। তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী- আল্লামাহ্ আবদুর রহমান মুবারকপুরী ৩৪। ই'লামুল মুয়াককিঈন- ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ৩৫। তাদবীনুস সুন্নাহ্- ড. মাতার আয যাহরানী ৩৬। তাইসীর মুসত্বলাহিল হাদীস- ড. মাহমূদ আত্ ত্বহন ৩৭। তারীখে কাবীর- ইমাম বুখারী

৩৮। তারীখে বাগদাদ- ইমাম আল খাতীব আল বাগদাদী ৩৯। তাযকিরাতুল হুফফায- ইমাম যাহাবী ৪০। সিয়ারু 'আলামিন্নুবালা- ইমাম যাহাবী ৪১। মিযানুল ই'তিদাল- ইমাম যাহাবী ৪২। আল- কামিল ফিত্তারিখ- ইমাম ইবনুল আছীর ৪৩। তাহযীবুত তাহযীব- ইমাম ইবনু হাজার ৪৪। আল- আন্‌সাব- ইমাম আসসামআনী ৪৫। আল- মাজরুহীন- ইমাম ইবনু হিব্বান ৪৬। মানাকিব আবী হানীফাহ্- আল মাক্কী ৪৭। উকূদুল জিমান- মুহাম্মাদ বিন ইউসূফ ৪৮। তাহযীবুল কামাল- ইমাম আলমিয্‌যী ৪৯। উসুলুদ্দীন ইন্দা ইমাম আবূ হানীফা- ড. মুহাম্মাদ আল খুমাইস ৫০। উলূমুল হাদীস- ৫১। মানাকিব আবী হানীফাহ ওয়া সাহিবাইহী- আয্ যাহাবী ৫২। বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন- শাহ আবদুল আযীয ৫৩। তা'জীলুল মানফাআহ্- ইমাম ইবনু হাজার ৫৪। মুখতাসারুল উলু'- শাইখ আলবানী ৫৫। শারহু কিতাব ফিকহিল আকবার- ড. মুহাম্মাদ আল খুমাইস। ৫৬। শারহুল আকীদাহ আত্-তাহাবীয়াহ- ইমাম ইবনু আবীল ইয ৫৭। মিনহাজুস সুন্নাহ- ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ৫৮। আল ইন্তিকা- ইমাম ইবনু আবিদল বার ৫৯। আত- তামহীদ- ইমাম ইবনু আবিদল বার ৬০। তারতীবুল মাদারীক- কাজী আবূল ফযল ৬১। মানাকিব মালিক- লিয্‌যাওয়াবী ৬২। আল ইসাবাহ- ইমাম ইবনু হাজার ৬৩। মানহাজ ইমাম মালিক ফি ইছ্‌বাতিল আকীদাহ- ড. সউদ আদ্‌দাজান ৬৪। হুলিয়্যাতুল আওলীয়া- ইমাম আবূ নাঈম ইসফাহানী ৬৫। আল ইরশাদ- ইমাম আবূ ই'আলা আল খালীলী ৬৬। আল- মুহাদ্দিস আল ফাসিল- ইমাম রামহারমাযী ৬৭। ইত্‌হাফুস সালিক- ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবূ বকর আদ দামেশকী ৩৮। তায্‌ইনুল মামালিক- ইমাম সুয়ূতী ৬৯। তানবীরুল হাওয়ালিক- ইমাম সুয়ূতী ৭০। মালিক- আমীন আল খাওলী ৭১। তাওআল্লী তাসীস- ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী ৭২। মু'জামুল উদাবা- ইমাম ইয়াকুত আল হাশাবী ৭৩। মানাকিব শাফেয়ী- ইমাম বায়হাকী ৭৪। আদাবুশ্

শাফেয়ী- ইমাম ইবনু আবী হাতিম ৭৫। মানহাজ ইমাম শাফেয়ী ফি ইছবাতিল আকীদাহ- ড. মুহাম্মদ আল আকীল ৭৬। আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ- ইমাম ইবুন কাছীর ৭৭। ত্বকাতুল হানাবিলাহ- ৭৮। মাসায়িল ইমাম আহমাদ- ইমাম আবূ দাউদ ৭৯। ইকাযুল হিমাম- শায়খ সালিহ আল ফুলানী ৮০। আল বাহর আর রায়িক- আল্লামা ইবনু নযম আল মাসরী ৮১। সিফাতু সালাতিন্নাবী- শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী ৮২। আলমীযান আল কুবরা- আশশারানী ৮৩। উসূলুল আহকাম- ইমাম ইবনু হাযাম ৮৪। মুকাদ্দামাতুল জারহি ওয়াত ত'দীল- ইমাম ইবনু আবী হাতীম ৮৫। কিতাবুল ই'তিসাম- ইমাম শাতুবী ৮৬। যাম্মুল কালাম- ইমাম আল হরাবী ৮৭। আল মাজ'মু- ইমাম নওয়াবী ৮৮। ইহতিজাজ বিশ শাফেয়ী- আল খাতীব বাগদাদী ৮৯। মাজমু ফাতুয়া- ইমাম ইবনি তাইমিয়্যাহ ৯০। মাসায়িল ইমাম আহমাদ- ইমাম আব্দুল্লাহ- তাহকীক ড. আলী ৯১। তাইসীরুল আযীয আল হামীদ- শায়খ সুলায়মান ৯২। সহীহ আল জামি- শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী ৯৩। মুসনাদ আহমাদ- ইমাম আহমাদ ৯৪। আররদ আলাল মুতারিয- আল্লামা ফিরোযাবাদী ৯৫। হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ- ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ ৯৬। হালিল মুসলিম মুলযামু- শায়খ সুলতান আল মাসুমী ৯৭। রাফউল মালাম- ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ৯৮। সহীহ সুনান আবী দাউদ—আল-আলবানী ৯৯। সহীহ সুনান আত-তিরমিযী—আল-আলবানী ১০০। সহীহ সুনান আন-নাসাঈ —আল-আলবানী ১০১। সহীহ সুনান ইবনু মাজাহ—আল-আলবানী।

লেখক পরিচিতি

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, ঠাকুরগাঁও জেলার সদর থানার রহিমানপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্বীয় গ্রামে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে দিনাজপুর উথরাইল আলিয়া মাদরাসা আলিম শেষ করে ভালভাবে আরবী শিক্ষার উদ্দেশ্যে মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী ঢাকায় অধ্যয়ন শুরু করেন এবং ১৯৯৬ সালে কৃতিত্বের সাথে দাওরা হাদীস সম্পন্ন করেন, পাশাপাশি বি, এ, এম, এ এবং (ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদরাসায়) কামিল তাফসীর ও হাদীস সম্পন্ন করে আরো উচ্চশিক্ষার জন্য মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়ে গমন করেন। বিশ্ব বিদ্যালয়ে পড়ার সাথে সাথে মাসজিদে নববীতে মাদীনাহ্‌র বড় বড় আলিমদের নিকটও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা নেন। মাদীনাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সাথে লিসান্স ও হায়ার ডিপ্লোমা সম্পন্ন করে সউদী ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক দাঈ হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। দেশে ফিরে এসে মাদরাসা দারুস সুন্নায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। তিনি বর্তমান কর্মজীবনের পাশাপাশি শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত। কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ইসলাম শিক্ষা সিরিজ তাঁর একটি অন্যতম গবেষণামূলক সিরিজ প্রকাশের পথে। তিনি বর্তমানে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আল হাদীস এন্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ অনুষদে উচ্চ শিক্ষায় গবেষণায়রত এবং ঐতিহ্যবাহী মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা এর প্রিন্সিপালের দায়িত্বে নিয়োজিত। আল্লাহ তাঁর দ্বারা ইসলাম ও মুসলিম সমাজকে উপকৃত করুন। আমীন!!

প্রকাশক